Vol. 31 | No. 1 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস


| | |
|---|---|
| Volume | 31 |
| Issue | 1 |
| Year | 1987 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | নূরুর রহমান খান |
| Published online | October 1, 1987 |
| DOI | 10.62328/sp.v31i1.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v31i1.4 |
| Pages | 113-174 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস

নূরুর রহমান খান

০১. বাঙ্‌লা কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস ও ছোটগল্পের উদ্ভব উনবিংশ শতাব্দীতে এবং দিনক্ষণের হিসেবে ছোটগল্প উপন্যাসের অনুজ। বাঙ্‌লা গদ্যের কান্তি ও সুষমা কথাসাহিত্যের গৌরবময় বিকাশের অবিসংবাদী সোপান। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সরণি শরণে বহু সহযাত্রীর পদসঞ্চারণ-অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিভূতি-তারাশঙ্কর-মানিক—বন্দ্যত্রয়ীর নিরলস সাধনায় বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের দিগন্ত স্বর্ণোজ্জ্বল। অতিরথ-মহারথীদের অনুচর সহগামী সার্থক মন্‌সব্‌দারদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। সাধনশক্তির সম্মিলিত সার্থক প্রচেষ্টায় বাঙ্‌লা উপন্যাস-ছোটগল্পের উত্তরণ সুবর্ণযুগে। বিশ্বব্যাপী জনতন্ত্রের জয়-জয়কারের কালে একক দিগ্‌বিজয়ীরা অনেকটা অন্তরালে, গণের সামষ্টিক শক্তি স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যাঙ্গনও ব্যত্যয়হীন। তবু এরই মধ্যে কোন কোন সৈনিকের তীক্ষ্ণ হাতিয়ারের দীপ্র ঔজ্জ্বল্য চমক হানে।

কালজয়ী সাহিত্যমাত্রই জীবন-সম্ভূত, জীবনচেতনারই উদ্ভাস। এবং সার্থক শিল্পী জীবনরসের রসিক বলেই জীবনশিল্পী। তাঁর পর্য-বেক্ষণ দৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসু মানস ও বিশ্লেষণ সামর্থ্যে জীবননাট্যের অনাবিষ্কৃত অঙ্গনও আলোকিত হয়ে ওঠে। এবং জীবনের বিচিত্র চিত্রে আমরা কখনো বিস্মিত, কখনো বা স্তম্ভিত। বৈচিত্র্যপূর্ণ সংঘাত-সঙ্কুল প্রতিবেশে বিসর্পিল জীবন-সন্ধানী ঔপন্যাসিক সুবিস্তৃত পরিবেশে তাঁর অলেখ্য সৃষ্টি করেন। অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং শৈল্পিক চেতনার সুসমন্বয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সদাসচেষ্ট। দিক্‌দিগন্তপ্রসারিত পটভূমিকায় অনন্ত জীবনের অতলান্তিক জিজ্ঞাসায় তিনি উন্মুখ ও মুখর। অখণ্ড জীবন রূপায়ণই তাঁর কাম্য। ঔপন্যা-সিকের দৃষ্টি তাই আদিগন্ত বিস্তৃত, বৈচিত্র্যে বর্ণাঢ্য। আর ছোটগল্প-কারের লক্ষ্য খণ্ডজীবনের কোন এক দুর্লভ মুহূর্ত—যার ব্যঞ্জনায়

অনির্বচনীয় অনন্তও বাঁধা পড়ে। 'উপন্যাস একটি আদ্যন্ত জীবনের মধ্যে অনন্ত অতলান্ত জীবনকে প্রতিফলিত করেছে ; —ছোটগল্প একটি মানবজীবনের যে-কোনো একটিমাত্র মুহূর্তের অভিভবতার অতলে সম্পূর্ণ অখণ্ড জীবনকে করে থাকে বিম্বিত।'[১] বক্তব্য আরো স্বচ্ছ পরবর্তী ব্যাখ্যায়, 'একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্ত প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে বিম্বিত,—সীমা-ব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। সকল সার্থক গল্পের মতই উপন্যাস ও ছোটগল্পও বস্তুময় জীবন-রূপকে প্রতিফলিত করে থাকে নিজ নিজ শিল্পরূপের মুকুরে।'[২] ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা ছোটগল্পকারের নেই এবং তাঁর সীমা-সরহদ্ যথেষ্ট সীমিত বলেই 'ছোটগল্পে ভাবের একমুখিতা, বক্তব্যের অদ্বিতীয়তা, প্রশ্নমুখিতা, স্পষ্টতা ও ঋজুতাই আরাধ্য। উন্মুক্ত বাতায়নে এক ঝলকের দেখাই ছোটগল্পের দেখা এবং তার মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাণস্পন্দনটুকুর নিপুণ উদ্ঘাটনই গল্পকারের সাধনা।'[৩]

কথাসাহিত্যের আঙ্গিক-শৈলী-উপজীব্য ইত্যাকার বিষয়ে সংখ্যাহীন সন্দর্ভ পুস্তক প্রণয়নান্তেও যেন চরম বক্তব্য এখনো অব্যক্ত। তারই সন্ধানে সত্যান্বেষীরাও নিরলস। সুতরাং আমরা তত্ত্ব-সূত্রের গহীন বিপিনাভিসারী না হয়ে সরাসরি বাঙ্লা কথাসাহিত্যের সমুদ্রসঙ্গমে সম্মিলিত অন্যতম কলকণ্ঠ সৈয়দ মুজতবা আলীর মূল্যায়নে অভিলাষী। স্মর্তব্য, ঔপন্যাসিক হিসেবে সংখ্যা কিংবা মানে তিনি আদৌ উল্লেখ্য নন এবং উপন্যাস অভিধায় চিহ্নিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সব ক'টি উপন্যাস পদবাচ্য কি না তা-ও বিতর্কাধীন। খ্যাতির তুলনায় গল্পের সংখ্যাও আশানুরূপ নয়। তবে তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি গল্প বাঙ্লা সাহিত্যে শুধুমাত্র 'বিশিষ্ট আসন' নয়—অমরতার দাবীদার। সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস:

ক. অবিশ্বাস্য
খ. শব্‌নম্
গ. শহ্‌র্-ইয়ার
ঘ. তুলনাহীনা।

আলী সাহেবের গল্প-উপন্যাসের বেশ কয়েকটি যেন তাঁরই আত্মকথা এবং কোন কোন লেখা স্মৃতিচারণায় শ্লথ মন্থর। দুটো উপন্যাসের

নায়ক লেখক নিজেই এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনুভূতি ও চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভা যথাযথ স্ফূর্তিলাভ করেছে। স্বভাবচাঞ্চল্যের জন্যেই বৃহত্তর পটভূমিতে স্বল্প চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বহুতর জীবনের খণ্ডরূপায়ণেই তাঁর সৃষ্টি-প্রবণতা ও পারদর্শিতা। ফলে মুজতবা আলীর ছোটগল্পের শিল্পনৈপুণ্য ও পরিপূর্ণতা তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত। এমন কি উপন্যাসে বহুপ্রত্যাশিত চরিত্রের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের স্বাক্ষরও নিশ্চিহ্ন। আবেগ এবং কাব্যোচিত ভাষাই তাঁর উপন্যাসের প্রাণ ও মূল উপাদান—ব্যত্যয় 'অবিশ্বাস্য'॥

০২. উপন্যাস হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রচেষ্টা—'অবিশ্বাস্য'—সফল রচনা। 'এর নায়কের জীবনের সুগভীর ট্র্যাজেডি, তীব্র বেদনাময় অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার অসহায়তা—একটা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পেরেছে।'[৪]

মধুগঞ্জ মহকুমা শহরে নবনিযুক্ত এসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ অব পুলিশ একুশ-বাইশ বছরের আইরিশ যুবক ডেভিড ও'-রেলি সেখান-কার প্রকৃতি ও স্থানীয় আধিবাসীদের প্রেমে হলো আকণ্ঠ লীন। প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন ও শ্বেত আভিজাত্যের অসার অহমিকার নির্মোক উন্মোচন করে 'ইয়োরেশিয়ান' তথা দেশজ অন্ত্যজ রূপে চির-চিহ্নিত শ্রেণীর সঙ্গেও একাত্ম হয়ে ওঠে। স্বভাবতই ও'-রেলির ভূমিকা স্থানীয় নির্ভেজাল ইংরেজদের চক্ষুসহন কিংবা মনোমোহন হয়নি। তারা বিমর্ষ, হেতু, 'ও'-রেলি ইজ গন্ কমপ্লীট্‌লী নেটিভ!' বছরখানের মধ্যেই বিলেত থেকে ও'-রেলি তার নব-পরিণীতা মেব্‌ল্‌কে নিয়ে এলো মধুগঞ্জে। এবং দিন পনেরো কোলকাতায় কাটিয়ে ফেরে কর্মস্থলে। ইতিমধ্যে একটা পরিবর্তন প্রকট হয়ে ওঠে তার মধ্যে। কিছুটা গম্ভীর। ক্লাব এবং বন্ধু-স্বজনদের সান্নিধ্য প্রায় পরিত্যাগ করে নিজের মধ্যেই আপনাকে সংহরণ করে নেয় অনেকখানি। শান্তশিষ্টা 'উত্তম রুচি' সম্পন্না কলেজে পড়ুয়া 'ডিসেন্ট গার্ল' মেব্‌ল্‌ও সমালোচনার পাত্রী হয়ে ওঠে। জোর গুজব 'মেব্‌ল্ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!' লাকাউড়া চা-বাগানের খুন এবং ঐ বাগিচারই ছোট সাহেবের আত্ম-হত্যার সংবাদে ও'-রেলি-মেব্‌ল্ সমাচার কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপনের অবকাশ পায়। ইতিমধ্যে মেব্‌ল্ প্রথম পুত্রের জননী হলো। সাড়ম্বরে নবজাতকের বাপ্তিস্মের ব্যবস্থা করলে ও'-রেলি। শিশু প্যাট্রিকের

গড্-ফাদার বা 'ধর্মপিতা' নির্বাচনে কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছিলো। ও'-রেলিরা ক্যাথলিক। প্যাট্রিকের ধর্মপিতাকেও তাই হতে হবে ক্যাথলিক। অবশ্য ব্যতিক্রমে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না। কিন্তু দেখা গেলো এক্ষেত্রে ও'-রেলি ধর্মান্ধ। তাই শেষ পর্যন্ত—ও'-রেলিদের বাদ দিয়ে—মধুগঞ্জের একমাত্র ক্যাথলিক বাটলার জয়সূর্যকেই হতে হলো প্যাট্রিকের ধর্মপিতা, তাবৎ শ্বেতাঙ্গদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও। চার বৎসর পর স্থির হলো মেব্‌ল্ বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে এবং সেখানেই তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা হবে। ব্যবস্থানুযায়ী ও'-রেলি গাড়ীতে কুড়ি মাইল দূরবর্তী স্টেশনে তাদের পৌঁছে দেবে এবং সেখান থেকে জয়সূর্য মেব্‌ল্‌দের জাহাজে তুলে দিয়ে দেশে যাবে। আরো এক বৎসর নিঃসঙ্গ কাটলো। তখনো ও'-রেলি শ্বেতাঙ্গ ক্লাবের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছে।

কানাঘুষোয় মধুগঞ্জে গুনগুনিয়ে উঠলো অতি মৃদু কম্পনে, 'মেব্‌ল্‌রা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয়নি।' এদিকে ও'-রেলি বদলী হলো রাধাপুরে এবং তার শূন্যস্থানে এলো 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড' থেকে 'খাস্ তালিম' প্রাপ্ত সদ্য ভারতাগত সামারসেট ডীন। পূর্বসূরীর বাঙ্‌লোও উত্তরাধিকারসূত্রে হলো তার আবাসস্থল। দিনকয়েকের মধ্যেই নৈশভোজ সমাপনান্তে বাঙ্‌লোর বারান্দায় বসে এক অভাবিত দৃশ্যে ডীন চঞ্চল হয়ে উঠলো। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয় রাত্রিতেও। "তিনটি প্রাণী... বেড-রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নেমে গেল।" দ্বিতীয় রাত্রে ডীন সাহেব পিস্তল হাতে ছুটেও গিয়েছিলো। কিন্তু সামান্য বিলম্বের সুযোগে ততক্ষণে 'ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

পুলিশের আই. জি. ডাড্‌নি সাহেব সরকারী কর্মোপলক্ষে মধুগঞ্জে এসে কথাপ্রসঙ্গে ও-রেলি দম্পতি সংক্রান্ত নানা গুজব শুনে এর প্রতিকারার্থে তথা মিথ্যা অপবাদ ও অপমানের পঙ্ককুণ্ড থেকে ও-রেলিকে উদ্ধারের মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সম্ভাব্য সর্বত্র মেব্‌ল্‌দের সন্ধান করে ব্যর্থকাম হলো। এমনকি বাটলার জয়সিংহের সিংহলের গ্রামের বাড়ীতেও সন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য—'সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরেনি।' তাই বড় সাহেব এ' ব্যাপারে সংগোপনে মধুগঞ্জে তল্লাসীর জন্যে ডীনকে লিখলো। অতঃপর অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ আস্থা রেখে—প্রত্যয়ী ডীন আপন দর্শনেন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করতে পারেনি—বাঙলোর বাগানের

মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করলো 'তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়, একটা মাঝারি, আরেকটি ছোট্ট শিশুর। এরই সূত্রে বড় সাহেবের প্রশ্নে ম্লান হেসে ও'-রেলি সোমের উদ্দেশে লেখা পত্র তুলে দেয় তার হাতে। পত্র নয়——মৃত্যু-পরোয়ানা——আপন অভিশপ্ত জীবনের রক্তালেখ্য। গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্ধাংশ জুড়ে দীর্ঘ স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ও'-রেলির প্যাথেটিক কাহিনী যেন নিয়তির ক্রীড়নক মানবভাগ্যের অমোঘতার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। এবং সম্ভবত নিয়তিই ত্রিমূর্তির বেশে সত্যের সন্ধান দিয়েছে, উদ্ঘাটন করেছে পাপের বীভৎস রূপ। 'পাপ' তাকে ট্র্যাজেডির তোরণ অবধি নিয়ে গেছে। চিঠির ছত্রে-ছত্রে পাষাণে প্রতিহত নিপীড়িত অসহায় মানবত্মার আর্তক্রন্দনধ্বনি বারংবার পাঠকের বক্ষে আশ্রয়সন্ধানী।

পিতৃমাতৃহীন ও'-রেলির 'জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, মেব্‌ল্‌কে দেখা।' গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে হাইডপার্কের সেই দুর্লভ মুহূর্ত:

> 'আমার সঙ্গে সমুদ্রের চারি চক্ষের মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে——নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণ শেষে আতপ্তকিশোর রৌদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন।
>
> সে সমুদ্র মেব্‌ল্।[৫]

প্রথম দর্শনেই প্রণয়, অতঃপর পরিণয়। বহু প্রতীক্ষিত শুভক্ষণেই প্রকৃতির রৌদ্র প্রকাশে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের আভাসিত ইঙ্গিতে 'ধর্মভীরু' মেব্‌লের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সে নির্ভরতা চেয়েছে ও'-রেলির মধ্যে। দাম্পত্যজীবনে চরমতম অবমাননায় উদ্ঘাটিত হলো কর্মজীবনে সার্থক ও'-রেলির মর্মান্তিক দুর্দৈব——সে 'নির্বীর্য——ইম্পটেন্ট'। চিকিৎসকদের দেয়া ক্ষীণতম প্রত্যাশা প্রতি রাত্রে তার ভাগ্যকে বিদ্রূপ করে ফিরে গেছে। দু' বছর স্ত্রীর নিকট থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলো। তারপর এক দুর্বল মুহূর্তের উদগ্র কামনায় পর্যুদস্ত ও'-রেলির যৌন-সম্ভোগেচ্ছার নিষ্ফল প্রচেষ্টা এবং 'সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্‌ল্ জয়সূর্যের ঘরে যায়।' অতঃপর ঘটনার দ্রুত পরিণতি। প্যাট্রিকের জন্ম, বাপ্তিস্ম এবং ধর্মপিতা হিসেবে বাটলার জয়সূর্য ইত্যাদি। গভীর নৈরাশ্যে ও'-রেলির স্বগতোক্তি——'শুধু মেব্‌ল্ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।' স্বস্তি কোথায়? অভিশপ্ত জীবন থেকে কি মুক্তি নেই?

অবশেষে সহজ সমাধান---আর্সেনিক প্রয়োগে তিনটি প্রাণ সংহার। পাশবিক সিদ্ধান্তটি অতি সুচারুভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছিলো। ও'-রেলির সুসঙ্গত দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কেউ তাদের খোঁজ করবে না। কিন্তু 'অযাচিতভাবে' 'মিত্র'রূপেই যেন অলঙ্ঘ্য নিয়তি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। কিংবা হিতৈষীর ছদ্মাবরণে কৃত পাপ-ই তাকে কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয় প্রায়শ্চিত্তের জন্যে। পত্রটিতে উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি চরিত্র পূর্ণতা পেয়েছে এবং ও'-রেলি-মেব্‌লের মধ্য দিয়ে লেখক অসহায় মানবভাগ্যকেই বিশেষভাবে চিত্রিত করেছেন।

মনস্তত্ত্ব আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান। এবং ফ্রয়েডের গবেষণার ফসল কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করতে গিয়ে কল্লোল-গোষ্ঠী এক সময়ে সমাজে নিন্দিত হয়েছিলো। অতি-আধুনিক উপন্যাসে যৌন-জীবন প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়:

> ...ফ্রয়েডের মতে মানুষের অনেক প্রচেষ্টাই মগ্নচৈতন্য-নিরুদ্ধ কাম-প্রবৃত্তির অজ্ঞাত প্রেরণাবশেই অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে যৌন-আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া বা কাম-প্রবৃত্তির দুর্বার সঙ্কেত স্ফুটতর করিয়া তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়।[৬]

এ-সত্যের খাতিরেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আলী সাহেবকে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং তার স্বীকৃতি: 'Sex নিয়ে লেখা যে কত শক্ত তা আমার কল্পনাতীত ছিল। শেষ কটা অধ্যায় লিখতে গিয়ে আমার জিভ বেরিয়ে গিয়েছে। ...ফাঁড়াটা কিন্তু কেটে গিয়েছে। এর পর আর Sex নেই। এখন শুধু খুনীর Psychology. কাজেই লিখতে অত বেগ পেতে হবে না।'[৭] বিদগ্ধ লেখকের সদাজাগ্রত শিল্পচৈতন্য উপ-ন্যাসটিকে সাধারণ যৌনাচারে পর্যবসিত করেনি। গ্রন্থে বিধৃত 'অসং-যমের' যে চিত্র, তা আদৌ 'ব্যভিচারের' পর্যায়ভুক্ত কি না সে-বিষয়েও দীর্ঘ তর্ক চলতে পারে। 'বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন বা তার অভাব, অভাবের ফলে ব্যভিচার----সমস্ত কাহিনীটার মূলে এ কথাই---... দুটি নিরপরাধ জীবন কী ভাবে ভাগ্যের হাতে অকারণ অকরুণ মার খেল---সেই বেদনাতেই পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, যৌন-জীবনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে না।'[৮] এখানেই আলী সাহেবের সাহি-

ত্যাদর্শের শুচিতা, তাঁর সাহিত্যদর্শনও বলা যেতে পারে। আধুনিকতার নামে সাহিত্যে বীভৎসতার আমদানী কখনো তাঁর অনুমোদন পায়নি। এবং সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্নেও তিনি কখনো দোদুল্যমান ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, পরিবেশনার কারণে যে-কোন বিষয় অশ্লীল হতে পারে, আবার আপাতঃদৃষ্টিতে অশ্লীল বস্তুও সৃজনী প্রতিভার স্পর্শে অনির্বচনীয় রসভুবন সৃষ্টির সামর্থ্য রাখে। এবং সাহিত্যিক জীবনে আলী সাহেব ছিলেন এই রসলোকেরই সন্ধানী। এবং ও'-রেলির কণ্ঠে যেন লেখকেরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত—'যৌন সম্পর্ক জীবনের অন্যতম গভীর সত্য। তাকে স্বীকার করে আমাদের কবিরা সত্যকে স্বীকার করেছেন মাত্র।' [ অবিশ্বাস্য, (১ম প্রকাশ), পৃ. ১৩৪ ]।

উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেই মুজতবা আলী সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতিমান রসস্রষ্টা। রচনাশৈলীর অনন্যতা ও ভাষার চমক ও ঠমকে পাঠককুল বিস্ময়াভিভূত। সুতরাং নবরূপে তাঁর আবির্ভাবকে কৌতূহলী পাঠক সাগ্রহে জানালেন স্বাগত। অনভ্যাসের ফলে ও চর্চার অভাবে বাঙলা ভাষার যে-ধারাটি প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছিলো মুজতবা তাতে প্রাণ-বারিসিঞ্চণ করে সতেজ সবুজ করে তুললেন এবং তা' প্রায় রাতারাতি। ফলে ঔজ্জ্বল্যের অত্যধিক দীপ্তি কারো কারো দৃষ্টিপীড়ার কারণও হয়েছিলো—বিশেষ করে অতিমাত্রায় ঐতিহ্যপ্রেমীদের নিকট। ফলে বৈরী কণ্ঠধ্বনিও অশ্রুত ছিলো না। প্রথম উপন্যাসটির জন্যে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে আলী সাহেব তাঁর এক গুণমুগ্ধ বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—"আপনি আমার লেখার যে প্রশংসা করেছেন তার দাওয়াই হিসেবে আপনাকে 'ঊষা' কাগজের আষাঢ় ১৩৬১র ... শেষ পাতা পড়তে অনুরোধ করি। ...আপনি বলেন, আমার লেখা আসমানের তারা, উনি বলেন, পিঠের পাঁচড়া...।"[৯] আলোচ্য উপন্যাসটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্বে মুজতবা-উল্লিখিত 'দাওয়াই'-এর স্বাদ কিছুটা গ্রহণ করা যেতে পারে—যদিও এতোটা অক্ষম আলোচনা সমালোচনারও অযোগ্য তবু শুধুমাত্র শ্রেণীবিশেষ পাঠকের গ্রহণক্ষমতা ও অনুভূতির ধারা অনুসরণের নিমিত্তই এর উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। শুচিতার প্রশ্নে সমালোচকের প্রথম উদ্গীরণ, "একই সঙ্গে হিন্দি ছবির প্রতি কটুক্তি বর্ষণ আর মুজতবা আলি সাহেবের 'কিতাব'কে সপ্রশংস স্বাগত জানান অসম্ভব।"[১০] মুজতবার শব্দ

প্রয়োগের বলিষ্ঠ প্রয়াস তাঁর বিবেচনায়, "আলি সাহেব যেন... নৈরাশ্যের মেঘ নিয়ে এসেছেন বঙ্গ-সাহিত্য ভূমিতে অসুন্দর বারি-বর্ষণের নিমিত্ত।...অসংযত, অসঙ্গত শব্দ প্রয়োগে যে তিনি অধিকতর সিদ্ধহস্ত, তাঁর এই নবতম রচনাতে এর স্বাক্ষর মিলে পাতায় পাতায়।"[১০ক] অবশ্য পুস্তকটির দ্বিতীয়ার্ধের 'সাবলীলতা' সন্দর্শনে ও মুজতবার শক্তির যৎসামান্য পরিচয় পেয়ে তাঁর শোকাহত চিত্তের জিজ্ঞাসা: '...যেখানে সুন্দরভাবে তাঁর পক্ষে কিছু লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, সেখানে এই বাচাল-বিলাসের আশ্রয় নেওয়া কেন?' বহু মূল্যবান উপদেশ-নসিহতের অমৃত বর্ষণান্তে সমালোচক মহাশয়ের অতি প্রাজ্ঞ উপসংহার: "মোটকথা মুজতবা আলী যে ভঙ্গীতে নিজেকে 'রপ্ত' করেছেন তাতে সার্থক কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—...তাঁর হাতে পূর্ণ চন্দ্র যেন খণ্ডে খণ্ডে ক্ষয় হয়ে অমানিশায় লীন হচ্ছে। নির্ঝরকে গণ্ডীবদ্ধ করলে কিছুদিনের মধ্যেই তা পচা-পুকুরে পরিণত হয়। সে পুকুরে পদ্ম ফোটে না, কচুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র তার অন্যান্য অবদান সহযোগে। আর তিনি সেই কচুরীপানার চাষই করছেন;...[১০খ]

সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্প-উপন্যাসে নারী চরিত্রেরই প্রাধান্য। পুরুষের উপস্থিতি অনেকটা ক্ষীণ—প্রায় নেপথ্যে। যাদের সাক্ষাৎ মেলে তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিত্বহীন, নিষ্প্রাণ 'রোবট' বিশেষ—যেন নারী চরিত্র পরিস্ফুটনের নিমিত্তেই তাদের আমদানী। নায়কের বদলে এসেছে খিদ্‌মৎগার! এবং এ-সব চরিত্রের যেটুকু বিকাশ তা' নিতান্তই নায়িকাদের অনুগ্রহের ফল—আপন বলিষ্ঠতা বা নায়কোচিত পৌরুষ-গুণে নয়। ব্যতিক্রম হিসেবে 'অবিশ্বাস্য'-র নায়ক ডেভিড ও'-রেলির সঙ্গে ও-হারা (টুনি মেম), কর্নেল ওবের্স্ট ডুটেনহফার (কর্নেল), খালাসী সমীরুদ্দী (নোনাজল) এবং আরো দু'-চারটি নাম সংযুক্ত হতে পারে।

সুদর্শন সুদেহী প্রাণবন্ত ও'-রেলির কবি হৃদয়, সুকুমার প্রবৃত্তি ও মানবিক অনুভূতি সহজেই পাঠকচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। তার ধমনিতে য়ুরোপীয় রক্তধারা, কিন্তু হৃদয়টি যেন দেশজ প্রতিবেশে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। সে য়ুরোপীয় বটে, কিন্তু ইংরেজ নয়, আইরিশ। এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে তার দেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ও'-রেলির রয়েছে সর্বাত্মক সমর্থন। একই কারণে ভারতীয় স্বদেশী

আন্দোলনের প্রতিও সংগোপনে তার সহানুভূতি। তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিলব্ধ সত্য—'এ সব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিশের কর্ম নয়, বিলেতে পার্লামেন্ট যাদি সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বই কমবে না।' [অবিশ্বাস্য, (১ম প্রকাশ), পৃ. ৬৬]। আবার ইংরেজের চাকুরে হিসেবে দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ সচেতন। ইংরেজের এ'দেশীয় চাকুরে এবং ও'-রেলির অন্তর্দ্বন্দ্বে কোন পার্থক্য নেই। একদিকে কর্তব্যবোধ অন্যদিকে বিবেক ও মনুষ্যত্ব। শেষোক্তটির প্রাধান্য-হেতুই সে জনগণের আপনজনে পরিগণিত হয়েছিলো। এমনকি ইংরেজের ঔরসে কুলি-কামীনদের গর্ভজাত পাদ্রী-টিলার মেয়েগুলোর প্রতিও তার স্নেহ অপরিসীম। সহকর্মী সোমের কাছে অকপটে ব্যক্ত করেছে—'আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলি বড় মিষ্টি স্বভাব [অবিশ্বাস্য, (১ম প্রকাশ), পৃ. ১৪]।

কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মানবিক কারণেই বন্যার সময় দিনের পর দিন সে কাটিয়েছে বিপন্নের সেবায়। সুন্দরী মেব্‌ল্‌কে স্ত্রী হিসেবে প্রিয়া রূপে পেয়েছিলো একান্ত সৌভাগ্যবলেই। মেব্‌লের প্রতি তার আস্থা ও ভালোবাসাও অন্তহীন। তারপরই আবিষ্কৃত হলো সত্যের নির্মমতম রূপ। বিদীর্ণ বক্ষে নিজেকে মেলো ধরেছে অভিশপ্ত ও'-রেলি :

> আমি দেখতে ভালো,...প্রাণবান পুরুষ,...স্বাস্থ্য ভালো,-অর্থের অভাব নেই, বিলাসেও আমার ঝোঁক নেই,...এবং সব চেয়ে বড় কথা মেব্‌লের মত সুন্দরী, প্রেমময়ী রমণী আমি পেয়েছি প্রিয়া-রূপে পত্নীরূপে, সে আমাকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবাসে, আমাকে সে হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়েছে
>
> এই পরিপাটি প্যাটার্নটি বোনার পর ভগবানের একি নিষ্ঠুর ঠাট্টা। না শয়তানের অট্টহাসি! এই পার্ফেক্‌ট প্যাটার্নটির উপর কে যেন ছড়িয়ে দিল নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত। ...সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বহু যত্নে তৈরী করার পর তার উপর কে যেন ছিটিয়ে দিল গোরক্ত। মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শূয়রের খুন্।[১১]

অতঃপর মুজতবা আলী স্তরে স্তরে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতম নায়ককে। যৌন সম্পর্ককে যে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতোই স্বীকার করে। 'মেব্‌লের ... নিশিকান্ত সৌন্দর্য' যার 'সর্ব ধর্মনীতে এক অদম্য যৌনক্ষুধা' জাগ্রত করে তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে দুমড়ে মুচড়ে দিশেহারা করে দেয়। সুস্থ মস্তিষ্কে মেব্‌ল্‌কেও সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে না—ইচ্ছেও ছিলো না। তার বিবেকবোধ বলে, 'ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যে রকম নর্দমা থেকে খুঁটে তুলে তুলে ভাত খায়। তাকে কি আমরা দোষ দিই? তবু কেন তিন তিনটে খুন হয়ে গেলো? ও'--রেলি স্বয়ং বিচারকের আসনে বসে তাদের শাস্তি বিধান করেছে। দিনের পর দিন সব কিছু ঘটেছে তারই প্রত্যক্ষে। তার দ্বন্দ্বের সমাধান কোন পথে? শান্তি কোথায়? তার মনে আর সংশয় নেই——"এরা পাপী, মরা উচিত এদেরই। মেব্‌ল্‌ পাপী, জয়সূর্য পাপী আর পেট্রিক ওদের পাপজাত সন্তান। আমি নির্দোষ, আমি কোনো পাপ করিনি। আমি কস্মিন কালেও কারো হকের ধন থেকে একটি কানাকড়িও কেড়ে নিইনি। এরাই দিয়েছে আমাকে ফাঁকি, এরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমাকে দেবে ফাঁকি।' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৬৮]। তারপরই মর্মান্তিক পরিণতি। ও'-রেলির পক্ষে এমন ভয়ঙ্কর পথে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব? এখানে লেখক সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। যে তিনটি প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছিলো, সেই বিচারকই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেও যেন পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের পটভূমি নির্মাণ করেছে:

> অপমান, আমার মনে হয়, আত্মার মৃত্যু। আর আত্মা যখন মরে যায় তখন মানুষ হয়ে যায় পশু। নির্মম জিঘাংসু এবং মারাত্মক পশু, কারণ আত্মা মরে গেলেও তার থেকে যায় বুদ্ধিবৃত্তি, যে বুদ্ধিবৃত্তি পশুর নেই। সে হয়ে যায় হাইড। যত রকম পাশবিক, নারকীয় জঘন্যম পাপ তখন সে করতে পারে আহির মনীয় বুদ্ধি, ছলচাতুরী দিয়ে।
>
> আমারও তাই হয়েছিল।[১২]

লেখক অত্যন্ত সতর্কতায় খুনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রবণতা যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর সহানুভূতি বর্মের মতোই পরবর্তী

প্রত্যাঘাত থেকে ও'-রেলিকে সযত্নে আড়াল করেছ। এবং সোমের প্রতি তার অন্তিম অনুরোধ:—

যদি ধরা পড়ি তবে আমাকে হয়ত ঝুলতে হবে।

... ... ... ... ...

আমার গোরের উপর নিচের দু'টোর যে-কোন একটা খোদাই করে দিতে পারো।

**( For a Godly Man's Tomb )**

Here lies a piece of Christ ; a star in dust
A vein of gold ; a china dish that must
Beused in Heaven, when God shall feast the just.

কিংবা

**(For a Wicked Man's Tomb)**

Here lies the Carcasse of a Cursed Sinner,
Doomed to be roasted for the Devil's dinner.'[১৩]

—ও'-রেলির প্রতি পাঠকদের সহানুভূতিশীল করে তোলে। স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসায়, সহানুভূতিতে কৃত্রিমতার প্রশ্নই অবান্তর। তাই মেব্‌ল্‌কে সে রুচিহীনা ইতর রমণীর পর্যায়ভুক্ত করে বিচার করেনি। একটি মাত্র উষ্ণ শ্বাসে তার রিক্ততা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে— 'শুধু মেব্‌ল্ দূর হতে আরো দূরে চলে গেল।' তাকে সহৃদয় পাঠকবর্গও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ না করে পারে না। সম্ভবতঃ কৃত অপরাধের শাস্তি নিজেই গ্রহণ করেছে বলে দৈবলাঞ্ছিত ও'-রেলি সাধারণের ক্ষমাও অর্জন করেছে।

নায়িকা মেব্‌লের শরীরী উপস্থিতি উপন্যাসের অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে। এবং তার মধ্যেও সে প্রায় বাক্‌হীনা। সহজ সৌন্দর্যের মধ্যেই বিলীন তার সারল্য। ভালোবাসার জনের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরতাই সে চেয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যের হাতে নিষ্কৃতি মেলেনি।

'ধর্মভীরু মেব্‌ল্' 'আকাশে বাতাসে, ঘাসে ঘাসে...ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলি দেখতে পায়।' বিয়ের দিন প্রত্যক্ষ করেছিলো ঈশ্বরের অপ্রসন্ন দৃষ্টি। তারও পূর্বে মেব্‌ল্ একটা ফুলের এক একটি "পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে 'হি লাভ্‌স মি', পরেরটায় বলছে 'হি লাভ্‌স মি নট' এই করে করে ভাগ্য গণনা করছে।..

ও'-রেলির মনে পড়ল, মেব্‌ল্ সেদিন তার কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, 'আমি সবসময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি 'হি লাভ্‌স মি'-তেই শেষ হবে। একদিন যখন হ'ল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে গেলুম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরো-খানা তখনো বোঁটায় লেগে আছে।" [অবিশ্বাস্য, পৃ. ৩৭]। এ-বক্তব্যের মধ্যেও সুকৌশলে ভবিতব্যের ইঙ্গিত দে'য়া হয়েছে। নিষ্পাপ দুটো হৃদয় প্রেম-পরিপূর্ণ হলেও অশুভ নিয়তি একটিকে করে রেখেছে পঙ্গু এবং তাকে আশ্রয় করেই দুটো জীবনের ওপর নিপতিত হলো ভাগ্যের নির্মম আঘাত। ভাগ্যকে মেব্‌ল্ তো মেনেই নিয়েছিলো। এমন কি ও'-রলিকেও স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এবং অন্তর্দহনে নিজেকে পলে পলে নিঃশেষ করেছে—যদিও তার বাহ্য প্রকটন ছিলো না। তার নিঃসঙ্গ নির্বাক আত্মদহন সর্বাধিক প্রত্যক্ষ করেছে স্বয়ং ও'-রেলি এবং তারই পত্রে উল্লেখিত: 'খুব সম্ভব আমার দেখাদেখি মেব্‌ল্ও বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল।...তার মনের কথা....তোমাকে বোঝাতে যাব না। তার প্রতি আমি অবিচার করেছি কিনা, তার বিচার একদিন হয়তো হবে, কিন্তু তার মনের কথা বলতে গিয়ে আমি যদি উনিশ-বিশ করে ফেলি তবে সে অবিচার... কেউ ক্ষমা করবে না।' [ অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৩৯ ]।

ও'-রেলির মফঃস্বল বাসকালে পাদ্রী জোন্‌সের বুড়ি মেমও অতি নিকটে থেকে মেব্‌লের সমস্যার কূলকিনারার সন্ধান পায়নি। গভীর রাতে তাকে বারান্দায় দেখেছেন ডেকচেয়ারে মুখ ঢেকে বিনিদ্ররজনী যাপন করতে। '...বুড়ি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকলো।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী টিলার বহু তরুণী-বিস্তর যুবতীর অনেক বুক ফাটা কান্না দেখেছেন'—কিন্তু এ তরুণীর বেদনার সন্ধান

শত চেষ্টায়ও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত। যৌবনের তাড়নায় সে জয়-সূর্যের ঘরে গিয়েছে এবং তীব্র গ্লানি নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ও'-রেলির পদতলে। নিছক জৈবিক ক্ষুন্নিবৃত্তির কাছে পরাজিত মেব্লের ক্ষুধা জয়সূর্য কেন, যে-কোন সমর্থ পুরুষই মেটাতে পারতো। কিন্তু সে বহুচারিণী নয়, এমন কি তাকে দ্বি-চারিণী হিসেবেও নির্দেশ করা যায় কিনা---তা-ও তর্কাতীত নয়। ও'-রেলি তাকে যা দিতে পারেনি শুধু সেটুকুই সে নিয়েছে মাত্র একজনেরই কাছ থেকে। ক্লাবে যাবার সুযোগও মেব্ল্ কখনো নেয়নি বা সে অভিপ্রায়ও তার ছিলো না। সর্বশেষ তাকে দেখেছি চিরন্তন মা, শাশ্বত জননীর মূর্তিতে। এবং সেখানে তো কোন রকম খাদ নেই। পৃথিবীর তাবৎ স্নেহ-বৎসলা জননীদের সঙ্গে একাসনে তার স্থান। মেব্লের মাতৃরূপে বিমুগ্ধ, হয়তো বা কিছুটা ঈর্ষাকাতর ও'-রেলির অভিব্যক্তি: 'দেখলুম, মাতৃত্বের রসে মেব্লের দেহখানির প্রতি অঙ্গ কি অপরূপ পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য পেয়েছে। যেন এদেশের বর্ষার ভরা পুকুর। [ অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৬৬ ]। প্যাট্রিকের অসুস্থতায় তার প্রচণ্ড উদ্বেগ এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবেই সে স্বদেশে অর্থাৎ বিলেত যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো। শেষ ডিনারে জয়সূর্যকে একই টেবিলে আমন্ত্রণ জানাতেও ছিলো তার যথেষ্ট আপত্তি। সহৃদয় যুক্তিবিচারে মেব্লের 'পদস্খলন' শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে তাকে ঘৃণার পাত্রীতে পরিণত করে তার মৃত্যুদণ্ড বিধান করে না। লেখকের প্রবীণ পর্যবেক্ষণ সূক্ষ্মতার শীর্ষে পৌঁচেছে মেব্ল্ এবং ও'-রেলির চরিত্রাঙ্কনে। সহানুভূতির পেয়ালাটি পরিপূর্ণ না থাকলে এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা একাত্ম না হলে এমন চরিত্রচিত্রণ সম্ভব না-ও হতে পারে। লেখক ও পাঠকের অশ্রুজল অভিশপ্তদের ক্লেদ যেন অনেকটা ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

'অবিশ্বাস্য'-র অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর সুধাংশু সোম, রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী, পুলিশ অফিসার সামারসেট ডীন সুচিত্রিত। খুনী কুলি সর্দার ক্ষণিকের আবর্ভাবে আমাদের সন্ত্রাসিত করে।

গুণমুগ্ধ ও'-রেলির দৃষ্টিতে সোম: 'বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মত; কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী

ফল। [অবিশ্বাস্য, পৃ. ৬৯]। সোম শুধু বুদ্ধিমানই নয়, হৃদয়বানও বটে। ওপরওয়ালা হিসেবে নয়—ও'-রেলিকে সে ভালোবেসেছিলো তার চারিত্রিক মাধুর্যের কারণেই। বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশংসনীয় হাজির-জবাব চরিত্রটির বিশিষ্ট দিক। পাদ্রীর প্রশ্নে "সোম বললে, "স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?'

.. .. ..

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে সব কটা মেকি।'

সোম বললে, . . .এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ও-দিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেন নি। বাজিয়ে দেখবো কি করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব ক'জনাই মেকি," [অবিশ্বাস্য, পৃ. ২৩]—উল্লিখিত সংলাপের মধ্য দিয়ে সোম সুপ্রকাশিত।

রায়বাহাদুর অনেকটা 'টাইপ' চরিত্র। খেতাবেই তার রাজানুগত্য স্বপ্রকাশ। বৃদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রলাভে 'বারের' পক্ষ থেকে তার অভিনন্দন —'আদালতের পুত্র সন্তান হওয়াতে আমরা সকলেই বড়ই আনন্দিত. . .।' অবশ্য মাঝে মধ্যে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বালোচনা করে রায়বাহাদুরির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ও'-রেলির কালা আদমীদের সঙ্গে দহরম-মহরমে তার অনুমোদন নেই। যুক্তি : "নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে; আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তী ইয়ার্কী কি রে বাবা? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াবেন?' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৫-১৬]।

আদিম সমাজের আদিমতম রক্তধারার পরিচয় লাকাউড়া বাগিচার কুলি সর্দার ও তার বউ-এর আচরণ ও সংলাপে। পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে সর্দারস্ত্রীকে খুন করে তার ছিন্ন মস্তক থানায় জমা দিতে গিয়ে গ্রেফতার হয়। নারকীয় হত্যার স্বপক্ষে সর্দারের যুক্তি : "করবো না? বেটি আমাকে বললে, 'দেখ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চটে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না,

এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ্-ই-ঠো লড়কী নই। আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ্-ই-ঠো মর্দ নস্; তুই বেছে নে তোর-টা, আমি বেছে নি হ্মার-ঠো।' ঐসী বেতমিজী? হারামজাদী, আমার মুখের উপর এই রকম বেশরম বাৎ বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি, হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে,··”১৪

মুজতবা আলীর জীবনী-অংশে আমরা তাঁর চরিত্রে বৃটিশ-বিদ্বেষের হেতু নির্দেশের চেষ্টা করেছি।* আলোচ্য উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম নেই। ও-রেলির ভাষ্যে এ-দেশের দারিদ্র্য ও সহোদর উপসর্গগুলো যে শোষকদেরই অবদান সে-কথা লেখক নোতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মধুগঞ্জ যাবার পথে এ দেশের দীন-দুঃখীদের করুণ-ক্লিষ্ট ছবি দেখে ব্যথিত মেব্‌লের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে নায়কের উক্তি: 'আমি আয়ারল্যান্ডের ছেলে, ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমার দেশে কি হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুটা সচেতন, কিন্তু লন্ডনের মেয়ে মেব্‌ল্ এসব জানবে কি করে? আবার সব দারিদ্র্যের জন্য কেবল ইংরেজই দায়ী, এই সহজ সমাধানই বা তাকে বলি কি প্রকারে? [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১১৮]।

মুজতবা আলীর ভূত-প্রেত কিংবা অলৌকিকতায় আস্থা স্থাপনের কথা নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তিনি অলৌকিকতা কিংবা সংস্কার ও প্রচলিত লোকবিশ্বাসকে সার্থকভাবে তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন এবং গল্পের মনোহারিত্ব তাতে অনেকাংশে বৃদ্ধিও পেয়েছে। ভূতের আহ্বানে মাঠে নেমে, সাঁওতাল ছেলের মৃত্যুবরণ (বাঁশী), ভাগ্যগণনা এবং তাতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ('কোষ্ঠী বিচার' এবং 'দ্বিজ') কিংবা মেব্‌ল্-ও'-রেলির অনভিপ্রেত দাম্পত্য-জীবনের আভাস এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাদের বিয়ের দিনই ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা রুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিলো।——'পুরোত যখন ভগবানের নামে একে অন্যাকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন, তখন বাইরে ভগবান ছাড়ছিলেন তাঁর হুঙ্কার, বৃষ্টিঝড় আর বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে।......আমি [(ও'-রেলি)] যখন মেব্‌ল্‌কে বিয়ের আঙটি পরাচ্ছিলুম ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠে গির্জের সমস্ত রঙীন

*লেখকের পি.এইচ-ডি অভিসন্দর্ভ 'সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি'।

শার্সিগুলোতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।....পুরোত যখন গম্ভীর কণ্ঠে....সুধালেন, এই যুবক যুবতীর মিলনে কারো কোনো আপত্তি আছে কিনা, তখন বড় বড় করে বাজ পড়েছিল----'[অবিশ্বাস্য, পৃঃ ১১১]

এখানেই সমাপ্তি নয়, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সামারসেট ডীন যে পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানে পৌঁচেছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা' আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অলৌকিকতাই তার মীমাংসার দিক্-দর্শক। আই. জি. মিঃ ডাড্নির উদ্দেশ্যে ডীনের পত্র:

> এ বাংলোয় প্রথম দু' রাত্রি আমি যে ত্রিমূর্তি দেখে ছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। যে গাছতলায় ছায়া মূর্তিগুলি হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলুম। আপনার সব তল্লাসীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন, কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যান্ডের ইয়ার্ডের কাছে যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।[১৫]

অন্যান্য রচনার মতো মুজতবার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীটি তাঁর উপন্যাসেও প্রতিফলিত। কথায় কথায় এসে পড়ে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য তুলনামূলক আলোচনা। উইট, হিউমার এবং সাধারণ রসিকতা বা চুট্‌কিও অবলীলায় আপন স্থান করে নেয়। সাধারণ ঘটনাও বর্ণনামাহাত্ম্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে। কথার মুখে এক সময় থমকে পড়েন, যেন সম্বিতে এসে পাঠক-শ্রোতার দরবারে সাফাই গাওয়ার সুরে স্বগতোক্তি ধ্বনিত, 'কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম।' আসলে তাঁর কাহিনী নোঙর ছেড়ে বহু ঘাট ছুঁয়ে, একাধিক বন্দরে লেনদেন করে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। ঘাটের কথা পথের অভিজ্ঞতার স্বাদ পাঠকের ভাগ্যেও জোটে। সম্ভবতঃ এমন সাহিত্য রচয়িতার দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের নজরকে সময়ে অসময়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অবশ্য তাতে গল্পের মৌতাত পুরোমাত্রায় বিদ্যমান এবং কাহিনীর সঙ্গে সুসংবদ্ধ বলে কখনো অপ্রাসঙ্গিকতার দোষ-দুষ্ট নয়। যেমন, ও'-রেলি চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের

পর্যালোচনায় 'আহুর মজ্‌দা' 'আহির মন্‌'-এর সূত্রে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত। এসে যায় সর্ব প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত ভয়াবহ বন্যার কথা----'প্রাচীন আসিরিয় বাবিলনীয় প্রস্তরগাত্রে' যে কাহিনী চিত্রিত, বাইবেলেও রয়েছে যার উল্লেখ। ভারতীয় 'শাস্ত্রেও আছে কেশব তখন মীন শরীর ধরে বেদ বাঁচিয়েছিলেন, অর্থাৎ সে বন্যায়' এ দেশের 'সভ্যতা সংস্কৃতি ভেসে যায়নি, কোনো এক মহাপুরুষ তার শ্রেষ্ঠতম জিনিস বাঁচাতে পেরেছিলেন।' এরই সূত্রে আলী সাহেব 'একটি আধা-খৃশ্চানী আধা-মুসলমানী গল্প'-এর অবতারণা করেন। সেই বন্যার পূর্বে জেহোভা নূহ নবীকে সতর্ক নির্দেশ দিলেন: 'বন্যায় সব ভেসে যাবে, তুমি একটা নৌকো বানিয়ে তাতে পৃথিবীর সব গাছ, ফুলের বীজ এবং যত প্রকারের প্রাণী এক এক জোড়া করে রেখো। বন্যার পর তাই দিয়ে পৃথিবী আবার আবাদ...করবে।

নূহ তাই করলেন, কিন্তু বন্যার পর দেখেন,... ইঁদুরে তাঁর আঙ্গুরের বীজ খেয়ে ফেলেছে।...

ওদিকে কিন্তু হুশিয়ার শয়তানও সব মাল এক এক প্রস্ত করে রেখেছিল। সে তখন নূহকে তার বাঁচানো আঙ্গুরের বীজ দেবার প্রস্তাব করলে...

পৃথিবীর জমিতে শয়তানের স্বত্ব নেই। তাই শর্ত হল, নূহ দেবেন জমি, শয়তান দেবে আঙ্গুরের বীজ। গাছের তদারকিও ৫০/৫০।

নূহ ত যত্ন করে সকাল সন্ধ্যা চারার গোড়ায় ঢালেন সুমিষ্ট, সুগন্ধী বসরাই গোলাপ জল আর শয়তান ঢালে গোপনে গোপনে না-পাক শূয়রের রক্ত।

নূহের পাকপানির ফলে ফ'লে উঠল মিষ্টি আঙ্গুর ফল। কিন্তু শয়তান যে দিয়েছিল না-পাক চীজ; তারই ফলে আঙ্গুর পচিয়ে তৈরী হয় মদ। সেই মদ খেয়ে মানুষ করে মাতলামো, যত রকমের জঘন্য পাপ।' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১২৪-২৫] এবং নায়কের জীবনে এই 'প্যাটার্নটির' প্রতিবিম্বন ড. আলী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রস্ফুটিত করেছেন।

অনবদ্য বর্ণনার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'লাকাউড়া বাগিচার' ছোট সাহেবের আত্মহননের চিত্রটি তুলে ধরা যেতে পারে। আত্মনাশের সূত্র অনাবিষ্কৃত। সুতরাং কাল্পনিক অশ্বের অবাধ বিচরণ।——

'কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে ক্ষেপে গিয়ে (ছোট সাহেব) মদ ধরে—তাও আর কুলীদের ধান্যেশ্বরী—তারপর দিবারাত্তিরের সে মদের নেশায় ছ' ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার ক'রে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।'[১৬]

**উইট, হিউমার ও চুট্‌কির নিদর্শন**

ক. 'আবহাওয়ার জ্যোতির্ষিরা বললেন, বৃষ্টি হবে, অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরলেন; ফলং?——ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৯]

খ. 'সোম (ও'-রেলির বিয়ের) খবরটাকে বিয়ে বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পৌঁছে গেল পাদ্রী বাঙলোয় পোপের মৃত্যু-সংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে এবং চোখের জোয়ার জাগালো নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ১৪]।

গ. সামারসেট ডীন তাঁর বাঙ্‌লোতে ত্রিমূর্তির আবির্ভাব প্রসঙ্গে আই. জি. সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন কাজী এবং বাবুর্চীর গল্পটি। খাবার টেবিলে পরিবেশিত মুরগীর একটি ঠ্যাং দেখে কাজী সাহেব দ্বিতীয়টির কথা জানতে চাইলে বাবুর্চীর উত্তর, মুরগীটির একটি ঠ্যাং-ই ছিলো এবং সেটা প্রমাণের উদ্দেশ্যে,—'শীতকালে একদিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতরে গুঁজে দাঁড়িয়েছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে এক ঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাততালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালালো। কাজী বললেন, ঐ তো দুস্‌রা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে,

সেদিন খাওয়ার সময় তিনি তালি দিলে দুসরা ঠ্যাংও বেরতো।' [অবিশ্বাস্য, পৃ. ৮৬]।

সম্পূর্ণ অব্রণ না হলেও 'অবিশ্বাস্য' ভালো উপন্যাস। কাহিনী, চরিত্র, পটভূমি ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের গুণাবলী ও উপাদান বর্তমান। কিন্তু লেখকের চিত্তলোকটিই ঔপন্যাসিকের নয়। ফলে সুস্থিরভাবে ধীর লয়ে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। তদুপরি সম্পাদকের তাগিদ তো ছিলোই এবং উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকায়——ধারাক্রমে। পরিণামে সম্ভাবনাময় চরিত্রগুলোও স্বাভাবিক পরিণতি লাভে বঞ্চিত। তাদের সক্রিয়তা প্রকাশিত অন্যের ভাষ্যে। বিশেষ করে মেব্লের দ্বন্দ্ব-দহন, তার নিঃসঙ্গ জীবনের অভিশাপ স্তরে স্তরে বিকাশের বিকল্প হিসেবে অতি সুলভ ও সহজ পন্থায় এসেছে কাহিনীর উপসংহার। ফলে নায়ক চরিত্রটিও অনেকাংশে ম্লানিমায় আচ্ছন্ন। এবং সম্ভাব্য একটি অত্যুৎকৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পরিণতি সাধারণ প্যাথেটিক কাহিনীতে।

০৩. সৈয়দ মুজতবা আলীর পরবর্তী উপন্যাসত্রয় নায়িকাপ্রধান এবং নায়িকার নামেই——'শব্নম্' ও 'শহ্‌র্-ইয়ার'——প্রথম দুটোর নামকরণ। নায়িকার বিশেষণ——'তুলনাহীনা'——তৃতীয়টির অভিজ্ঞান এবং উল্লিখিত ত্রয়ী-ই তুলনাহীনা।

বাঙালী মুসলমান সমাজ ও চরিত্র উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণের জন্যে মুজতবা বারংবার অনুরুদ্ধ হয়েছেন, ইচ্ছেও ছিলো, কিন্তু শঙ্কা-সংকোচের বর্ম ভেদ করে এ কর্মে দীর্ঘদিন সাহসী হননি। এবং তা' সম্পূর্ণ অকারণও নয়। এ' মর্মে ড. আলীর একটি পত্রাংশ:

> বাঙালী মুসলমান মেয়েদের নিয়ে লেখায় মুশকিল এই কারণে, যে যেখানেই পর্দাপ্রথা চালু সেখানে কোন মেয়ের সঙ্গে সরল বন্ধুত্ব পর্যন্ত হতে পারে না। যে-টুকু বা সুযোগ পাওয়া যায়, তাও আমি পাইনি, কারণ প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি বাঙলা দেশের বাইরে।
>
> তবে বলতে পারো, শব্নম্ লিখলুম কি করে? সে তো phantasiat কল্পনার তৈরী। অবশ্য তুর্কী রমণীদের ইতিহাস আমি মন দিয়ে

পড়েছিলুম এবং আমানুল্লার মায়ের দারুণ দাপটের কথা জানতুম। সেটা অনেক সাহায্য করেছে।[১৭]

তাঁর নায়িকার সতেজ কণ্ঠেও এর সগর্ব স্বীকৃতি। একাকী অভিসারের দুঃসাহসিকতার প্রশ্নে শব্‌নম্‌ স্মরণ করিয়ে দেয়: 'আমরা আসলে তুর্কী। আমাদের বাদশা আমানুল্লার গায়েও তুর্কী রক্ত আছে। আর তুর্কী রমণী কি জিনিস সেটা জানতেন আমানুল্লার বাপ শহীদ হবীবুল্লা।'[১৮]

বাস্তবের কাঠামোতে কল্পনার তুলিকাস্পর্শেই সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি। এবং জীবনের সঙ্গে ক্ষীণসূত্রে অন্বিত নভোচারী কল্পনার আধার রোমান্টিকতার উৎস। ফলে বন্ধনবিহীন আবেগ ও হৃদয়াভিসার উপন্যাসেও কবি কল্পনার প্রশ্রয়ে আপন স্রোত খুঁজে নেয়। কঠিন জীবনধর্মী সৃষ্টির সঙ্গে এর পার্থক্য সূচিত প্রধানতঃ ভাষার মাধ্যমে। কল্পনাহীন রচনা সাহিত্য নয়, আর কাব্যিক শৈলীতে কল্পনারি সুসমঞ্জস অতিরেক রোমান্টিকতা। এবং তা' কখনোই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভুবন-বর্জিত নয়। 'রোমান্টিক দৃষ্টির বিষয়ও সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত হইতে পারে, কিন্তু সে দৃষ্টি বাস্তবদৃষ্টির মত সাক্ষাৎ ও স্বচ্ছ নয়। তাহা কালাতীত ভাবনার ইমোশনের রঙে রঞ্জিত হইয়া ভবিষ্যতের পানে প্রসারিত।...সাহিত্য সৃষ্টির ধাতই রোমান্টিক। তবে তাহাতে সাহিত্যস্রষ্টার জীবনবোধের পরিচয় যতটুকু থাকে তাহাতে সম্ভাব্যতার পরিমাণ লইয়াই রিয়ালিজমের ও রোমান্টিসিজমের মাত্রা নির্ধারণ করা চলে।'[১৯] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর ভাষায় গীতিকাব্যের সুর অনুরণিত। বাঙলা উপন্যাসের প্রদোষলগ্ন থেকে এ'ধারা অদ্যাবধি বহমান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় সর্বোত্তম বিকাশ। মণীন্দ্রলাল বসু (রমল্যা)-বুদ্ধদেব—অচিন্ত্যকুমার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-তারাশঙ্কর-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের বলিষ্ঠ আবির্ভাবে এ'ধারা সুসমৃদ্ধ। সগোত্র না হলেও এ' ধারার পরবর্তী সংযোজন সৈয়দ মুজতবা আলী। কাব্যধর্মী উপন্যাসের আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত ড. আলী সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য:

ক. 'তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপ্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য।' এবং 'উপন্যাসের শেষে যে রেশ আমাদের অনুভূতিতে স্থায়ী হয় তাহা গীতিকাব্যের।'[২০]

খ. 'উপন্যাসের বস্তু-অবয়বকে ভেদ করিয়া উহার কাব্য-আত্মা নিগূঢ় প্রকাশে ক্ষণদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন চরিত্রেরই দৃঢ় ব্যক্তিসত্তা নাই—ইহারা প্রত্যেকেই একক—আবেগকেন্দ্রঘূর্ণিত প্রাণকণাসমষ্টি।'[২১] —শব্‌নম্‌—সহ্‌র্‌-ইয়ার-শিপ্রা—মুজতবার রোমান্টিক উপন্যাসত্রয়ের 'তুলনাহীনা'রা যেন এদেরই স্বর্ণালি সংস্করণ।

তিন পর্যায়ে সমাপ্ত 'শব্‌নম্‌' উপন্যাসের ঘটনাস্থল আফগানিস্তান। নায়ক মজনূন বাঙালী এবং নায়িকা তুর্কী বংশোদ্ভূত কাবুল-তনয়া শব্‌নম্‌ বানুর জন্ম প্যারিসে, শৈশবও অতিক্রান্ত সেখানে। স্বাধীনতা দিবসে পাগমান শহরে আয়োজিত 'বল-ডান্স'-এ এসেছিলো সর্দার আওরঙ্গজেবের কন্যা শব্‌নম্‌। আর সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে পথহারা মজনূনের সঙ্গে তার দর্শন নাটকীয়ভাবেই। মুগ্ধ নায়কের দৃষ্টিতে—'কপালটি যেন তৃতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র।... একদম পাগমান পাহাড়ের বরফের মতই ধবধবে সাদা।...নির্জলা দুধের মত।...বন-মল্লিকার পাপড়ির মত।'[২২] প্রথম দর্শনেই নায়ক বিবশ বিহ্বলচিত্ত এবং পরদিন দ্বিতীয় সাক্ষাতে কবিতা ও লেবু বিনিময়। কাবুল নদীতে জলক্রীড়ার অবকাশে অপ্রত্যাশিতভাবে তৃতীয়বারের মতো পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে তাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা সুরভিত প্রভাতসমীরসম প্রকাশমান এবং উচ্চারণে চিরকালীন আশিক্‌-মাশুকের শাশ্বত সত্য—আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর মজনূনের নির্জনালয়ে শব্‌নমের প্রেমাভিসার—তার বক্ষদীর্ণ আর্তি, 'আমার বিরহে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না—ওইটুকুতেই আমার চলবে।'

দ্বিতীয় পর্বে আমীর আমানুল্লা য়ুরোপ সফরের প্রাক্কালে সর্দার আওরঙ্গজেবকে গভর্নর হিসেবে কান্দাহারে প্রেরণ করেন। মাতৃহীনা শব্‌নম্‌কেও জনকের অনুগামিনী হতে হলো। এ'পর্বে নায়ক-নায়িকার বিরহ-বেদনার পরিক্রমণ অনেকটা চিহ্নিত পথেই। পত্র যোগাযোগও ছিলো অচ্ছিন্ন। বছরখানেক পর শব্‌নমের কাবুল প্রত্যাবর্তন আকস্মিক-ভাবেই। একই সময় ডাকু সর্দার বাচ্চায়ে-সকাও চড়াও হলো কাবুলে

——লক্ষ্য রাজসিংহাসন। এই অরাজক পরিস্থিতির কারণেই শব্‌নমের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে তারা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বরণ করে পাঠানী কায়দায়—দু'পক্ষের দুই খিদ্‌মৎগার—আবদুর রহমান ও তোপল খানের উপস্থিতিতে। প্রকৃতপক্ষে এর পর থেকেই তাদের প্রেম-মহব্বত বিচ্ছেদ-বিরহের সুলভ কাব্যিক পথ-পরিক্রমার সূচনা। সন্ত্রাসিত কাবুল খুন্‌-লুটতরাজে বেহাল। বিরহ-দহন দু'জনেরই বক্ষে। মাসখানেক পর শব্‌নম্‌ এলো প্রিয়-মিলনের তরে। চলে আকাশ-কুসুম চয়ন আর বয়েৎবাজী, দৃষ্টিতে স্বপ্নের ঘোর। অবশ্য এর স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক দিবস। বিধিলিপিতে আস্থাশীল নায়ক কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করে প্রেমের সুবর্ণ মন্দিরে পৌঁছনোর গৌরব অর্জনের মহাভাগ্য থেকে বঞ্চিত প্রধানত রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে। বাচ্চার সেনাপতি জাফর খানের লালসা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই খোদ্‌ সর্দার আওরঙ্গজেব বিদেশী মজনূনকে তাঁর কন্যা শব্‌নম্‌ বানুকে শাদী করে তাঁদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে প্রস্তাব করেন এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে তাদের নিকাহ্‌-পর্ব হলো সুসম্পন্ন।

তৃতীয় অংশে—ব্রিটিশ লিগেশনে বিয়ের দলিল জমা দিয়ে এসে মজনূন কিস্‌মতের ভয়ঙ্কর রূপদর্শনে স্তম্ভিত। বাড়ী শূন্য। সেনাপতি জাফর খানের লোকজন তার জান্‌ শব্‌নম্‌কে লুট করে নিয়ে গেছে। স্বামীর উদ্দেশ্যে রেখে গেছে একটি মাত্র নির্দেশ ও প্রত্যাশা: 'বাড়িতে থেকো। আমি ফিরব।' অচিরেই খবর এলো—'জাফর খানকে গুলি করে মেরে...শবনম বীবী...অন্তর্ধান করেছেন।' অতঃপর শবনমের সন্ধান এবং মজনূনের বিরহের পালা। তথ্যের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের তত্ত্ব ও অধ্যাত্মকথা। শাস্ত্রীয় ঢঙে যেন বিরহজ্বালা-প্রশমিত নায়ক এক অনির্বচনীয়লোকের সন্ধান পেয়ে সমৃদ্ধমান হয়ে ওঠে। এবং সাকীর সন্দর্শন প্রত্যাশা জাগ্রত রেখে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

'শব্‌নম্‌' বাঙ্‌লা সাহিত্যে অভিনব সংযোজন। এর অভিনবত্ব রূপে রসে, আকর্ষণ গীতিধর্মিতায়। মনে পড়ে 'দেশে বিদেশে'র স্থবিরপ্রায় শিল্পীকে, যার সুরের গমকে বার্ধক্য অন্তর্হিত। শব্‌নম্‌-ও যৌবনের সাধনা, চির-তারুণ্যের মর্মরগাথা। এর শৈশব নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই—শুধু যৌবন আর জীবন। শব্‌নম্‌ পরতে পরতে প্রস্ফুটিত

নয়, নয় ক্রমবিলীয়মান। শরৎ-শর্বরীর দীর্ঘ তপস্যায় অশ্রুসিক্ত এ' শব্‌নম্ শিউলি পাপড়ি মেলে সূর্যকরস্পর্শের পূর্বেই ভূমিশয্যায় নিজেকে সমর্পণ করেছে। লেখক যেন অলক্ষ্যে জমজমাট মজলিসে সুগন্ধী আতর-দানের ঢাক্‌নাটি ঈষৎ উন্মোচিত করে অতি সন্তর্পণে সেটি গোপন করেছেন। সুরভীতে বিমোহিত জন সম্বিতে এসে সুগন্ধী-উৎসের সন্ধানে নেত্রপাত করে মাত্র ——ব্যর্থতার আক্ষেপ তীব্রতম নয়, সম্মোহনের ঘোর, রূপের নেশায় তখনো দৃষ্টি তার আচ্ছন্ন। হৃদয়ের প্রতিটি শোণিতকণা দিয়ে লেখক তাঁর 'তিলোত্তমা' শব্‌নম্‌কে নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে আত্মলীন স্রষ্টার মধুর একাত্মতার স্মারক উদ্ধৃত পত্রাংশ-টুকু: 'অত্যন্ত ক্লান্তির মাঝখানে...লিখছি। ... শব্‌নম্ আজ সন্ধ্যায় শেষ হল। ক্লান্তি সেই কারণেই,——এতদিন শব্‌নমের সঙ্গে সুখে দুঃখে কাটিয়েছি। আজ সে আমার কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিলে। নিজকে বড় নিঃসঙ্গ লাগছে।'[২৩]--শিল্পীর এ'নিঃসঙ্গতা বড় করুণ—— ততোধিক মধুর তার অনুভব। সৃষ্টি সমাপনান্তে তাতে স্রষ্টার অধি-কার কতোটুকু? তখন তো সেটি জনগণের সম্পদ এবং তা' গ্রহণ-বর্জনের মালিকও জনতা।

'শব্‌নম্' সম্বন্ধে আশাবাদী মুজতবা আলী যুগযন্ত্রণার যুগেও প্রেমের শাশ্বত কল্যাণময়ী রূপ ও শুচিতায় ছিলেন আস্থাশীল। নিম্নোক্ত পত্রটি তারই স্বাক্ষর :

> 'মাস খানেকের মধ্যে আমার একটি উপন্যাস [শব্‌নম্] বেরবে। ...মোলায়েম প্রেমের কাহিনী। বোধ হয় খারাপ হয়নি।... ধ্রুপদ ঢঙে লেখা। নায়ক নায়িকার ভ্যানিটি কেস চুরি করে না, নায়িকা নায়ককে কিডন্যাপ করে না।'[২৪]

স্নেহভাজনকে আশ্বস্ত করেছেন, '(শব্‌নম্) নির্ভয়ে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেওয়া যায়।'[২৫] এবং পরবর্তী একটি পত্রে আরো বিশদভাবে লিখেছে: "'শব্‌নম্' পড়ে তোমার ভলো না লাগলেও তার একটা জিনিস তোমার ভালো লাগার কথা। বিস্তর খেটে খুটে অনেক সুন্দর সুন্দর ফার্সী দোহা চৌপায়ী জোগাড় করে বাঙলায় তার অনুবাদ করে এ উপন্যাসে লাগিয়েছি। অনুবাদে একটিমাত্র শব্দ বাড়াই কমাইনি, শুধু বাঙ্‌লায় হ্রস্বদীর্ঘ নেই বলেই ফার্সী ছন্দ বজায় রাখা অসম্ভব।'[২৬]

দু'টি তরুণ হৃদয়ের নির্দ্বন্দ্ব প্রেমোপাখ্যান 'শব্‌নম্‌'। আদিগন্ত কল্পনার মহত্তম প্রকাশ। ভাষায় উদ্দাম ও স্নিগ্ধতার অপূর্ব মনিকাঞ্চন সংযোগ। শব্‌নম্‌-রূপসাগরে ডুব দিয়ে প্রমথনাথ বিশীর অভিজ্ঞতা—'এ যেন প্রজাপতির পাখা শিশির কণা ছড়িয়ে দিয়েছে মাঠের ঘাসে। এ নূতন, বর্ষাশেষের প্রথম শিশির বিন্দুর মতোই নূতন, কোমল, মধুর আর সুকুমার। .....রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালাতে বর্বরতা ও মাধুর্য দুই-ই রয়েছে। আলী সাহেব ঐ মাধুর্যটুকু ছিনিয়ে তৈরি করেছেন...শব্‌নম্‌কে। প্রণয়, মিলন ও বিভেদের গল্পটি ঊণতন্তুতে গাঁথা শিশির-বিন্দুর মালার মতো একদেহে হাসি অশ্রুতে ঝলমলিয়ে উঠে মুগ্ধ করে দেয়।'[২৭]

'শব্‌নম্‌'কে মুজতবা আলী উপন্যাস রূপেই আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রমথনাথ বিশীর মতো বিদগ্ধ সমালোচক-সাহিত্যিকও তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। পুস্তকটির উৎকর্ষ প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত, কিন্তু জাত-গোত্র নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা। কারো বিবেচনায় এটি গদ্যকাব্য অথবা শুধু রোমান্স রচনা। এতে উপন্যাসের উপাদান বর্তমান, কিন্তু উপন্যাস নয়। তাহলে এর শ্রেণী পরিচয়? সমাধানও রহস্যময়: 'এই ধরনের লেখাতে রোম্যান্সেরই অনিবার্য কুহক মিশে থাকে। শব্‌নম্‌ সম্বন্ধে সেই কথাই আসল কথা। কবিতায়, গদ্যে-ফার্সীতে-বাংলাতে-স্থূলে-সূক্ষ্মে,—লৌকিক বাস্তবতায় এবং অকৃত্রিম পরমার্থ প্রসঙ্গে এ এক অদ্ভুত ধরনের রম্য-রচনা হয়ে উঠেছে যাতে সৈয়দ মুজতবা আলীর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।'[২৮]

আলী সাহেবের শেষোক্ত তিনটি উপন্যাসই রোম্যান্সের স্বর্গলোক এবং তা' নায়িকাসর্বস্ব। শব্‌নম্‌ ও শহ্‌র্‌-ইয়ার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও সংবেদনশীলতায় সমতুল্যা। প্রথম জনের অবাধ বিচরণ কাব্যে, বিশেষতঃ ফার্সী কাব্যলোকে, দ্বিতীয় জনের মন-প্রাণ সমর্পিত রবীন্দ্রভুবনে, জীবন সঞ্জীবিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে। 'তুলনাহীনা'-তেও রবীন্দ্রকাব্যের অনায়াস সঞ্চরণ। মুজতবার নায়িকাদের শৈশব ও বার্ধক্য নেই—তারা শুধু যৌবন এবং যৌবনের। শহ্‌র্‌-ইয়ার বিবাহিতা, শব্‌নম্‌ প্রায় প্রণয় মুহূর্তেই পরিণীতা এবং 'তুলনাহীনা' শিপ্রা নায়কের সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমে চুক্তিবদ্ধা। সুতরাং বহুমুখী প্রণয় এবং তজ্জাত ঘটনা-সংঘাতের কোন প্রশ্রয় উপন্যাসগুলোতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অবশ্য শহ্‌র্‌-ইয়ারের দ্বন্দ্ব ভিন্নতর।

কাব্যকাননেই 'শব্‌নম্ শিউলি' কবির আবিষ্কার। ভিন্‌দেশী নায়কের ফার্সী উচ্চারণে তাঁর বিস্ময়, 'আপনার ফার্সী উচ্চারণে কেমন যেন পুরনো আতরের গন্ধ।... ঠাকুর মা সিন্দুক খুললে যে রকম পুরনো দিনের জমানো মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোয়।'[২৯] পরমুহূর্ত থেকেই 'বয়েৎ-বাজীর' সূচনা। 'শব্‌নম্'—শিশিরের সঙ্গে বাঙলাদেশের শিউলি ফুলের সম্পর্কের উল্লেখে উল্লসিত শব্‌নম্ কবি কিসাঈ-এর পুষ্পসংক্রান্ত চৌপদী শুনিয়ে দেয়। মুজতবার তর্জমায়:

অমরাবতীর সওগাত এই ফুল এল ধরাতলে,
ফুলের পুণ্যে পাপী-তাপী লাগি স্বরগের দ্বার খোলে।
ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে?
প্রিয়তর তুমি কি কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে?
[ শব্‌নম্, পৃ. ৭ ]

নায়ক মজনূন বাঙালী এবং ভারতীয়। নির্বাসিত পিতার সঙ্গে ফ্রান্সে প্রবাস জীবন কাটিয়ে ভারতের ওপর দিয়েই শব্‌নম্ কাবুলে ফিরেছিলো। সেই সুবাদে আবৃত্তি করে ইরানী কবি আলীকুলী সলীম-এর ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি:

'নীস্ত্ দর্ ইরান জমীন্ সামান-ই তহসিল কামাল
তা নিয়ামদ্ সূ-ই হিন্দুস্তান হিনা রঙ্গীন্ ন্ শুদ্।'

পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ছুঁয়ে,
মেহ্‌দির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।
[শব্‌নম্, পৃ. ৮]

সূচনালগ্ন থেকেই তাদের প্রণয় গাঢ়বদ্ধ। নায়কের ব্যাকুলতা হাল্‌কা হওয়ায় চিনার পত্রে মৃদু কম্পন, শব্‌নমের আবেগ পাহাড়ী ঝর্ণার উচ্ছল কলকাকলী। তার প্রত্যয়ী আশ্বাসে সামান্যতম অতি-রঞ্জন নেই, 'তুমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস কর, তোমাকে দেখার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, তুমি কখনো সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।' তারপর দীর্ঘ এক বৎসর অদর্শন বিরহের অবসান কান্দাহার থেকে কাবুলে শব্‌নমের প্রত্যাবর্তনে। কথার পাহাড় স্তূপীকৃত বিরহী হৃদয়ে,

কিন্তু কণ্ঠ নির্বাক। শুধু অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ মজনুনের প্রতি। নায়কের জিজ্ঞাসায় আবার কবিতার ফোয়ারা :

'ওয়াসিল্ হরফ্-ই-চূন্ ওচিরা বস্তে অস্ত্ লব
চূন রহ্ তমাম গলৎ জর্স বি-জবান সওদ।'
কাফেলা যখন পেঁ ৗছিল গৃহে মরুভূমি হয়ে পার
সবাই নীরব। উটের গলায়ও ঘন্টা বাজে না আর।
[শব্‌নম্, পৃ. ৪৮]

কবিতার নির্যাসে যে নারীর মানসগঠন, শিশির বিন্দুর মতোই বাহ্যদৃষ্টে যে শবনম্ টলটলায়মান, বাচ্চার আবির্ভাবে তার স্থির-মতিত্ব এবং অসাধারণ চারিত্র্যশক্তির অনমনীয়তা এক পরম বিস্ময়। এ' নারীর দেহ-মনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধিতে রয়েছে তুর্কী খুন আর পাঠানী হাওয়া। তাই প্রেমিককে পতিত্বে বরণে দ্বিধাহীনা, সিদ্ধান্তে অচলা। কাব্যলোকেই এ' নারীর ভালোবাসার দীক্ষা এবং প্রেম তাকে দিয়েছে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা। ভালোবাসার হক্ থেকে তাকে বঞ্চিত করবে কে? তাদের মিলনে কাল্পনিক সামাজিক প্রাতিবন্ধকতার প্রশ্নে তার তাৎক্ষণিক উত্তর :

> থোড়াই পরোয়া করতুম। ধর্মমতে তুমি আমি, সমাজ কেন, বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারি। কিন্তু সমাজ কি শের না বাবুর, বাঘ না সিংহ, যে তাকে হামেহাল পিস্তল দেখাতে হবে? সমাজ তেজী ঘোড়া। দানা-পানি দেবে, তার পিঠে চড়বে। বেয়ারামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুঁতো দেবে, আরও বেশি হলে চাবুক, আর একদম বিগড়ে গেলে পিস্তল। তারপর নূতন ঘোড়া কিনবে—নূতন সমাজ গড়বে।[৩০]

ভালোবাসায় নারীর অধিকার কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতায় ধর্মীয় অনুমোদনের প্রতি শহ্‌র্-ইয়ারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো :

> যে অধিকার মুসলমান মেয়ের ছিল ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকে, সেইটেই সে ব্যবহার করলো ইংরিজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, অন্দর মহল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। পাঠান মেয়েরা কিন্তু চিরকাল ধরে এ-হকটা দরকার হলেই কাজে

লাগিয়েছে।...তারা নাকি...বাপ-মার তোয়াক্কা না রেখে আপন পছন্দের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে।[৩১]

অরাজকতার সন্ত্রাস-ভীতি প্রিয়মিলনে বাধা হতে পারে না। শব্‌নমের অধিকারে কেউ প্রতিবন্ধক হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সশস্ত্র শব্‌নমের নির্ভীক অভি-ব্যক্তি—'কী? আমার ছেলে হবে শুধু শান্তির সুখময় নীড়ে? বকরীর কলিজা নিয়ে জন্ম নেবে তারা তা হলে।... আর আজ যদি আমি বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করে শয়তানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তোমার কাছে পৌঁছই তবে আমার ছেলে হবে বাঘের গুর্দা, সীনা, কলিজা নিয়ে।' [শব্‌নম্, (১ম প্রকাশ), পৃ. ৯৩-৯৪]। আবার অমিত সুন্দরী এ' নারীই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'আমি আমার ভালবাসা দিয়ে দেহের সৌন্দর্যকে হার মানাবো।'—কঠিন-কোমলে, চিনারের পেলবতা আর হিন্দুকুশের দৃঢ়তায় এ'নারীর সত্তা।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ডেই শব্‌নমের সঙ্গে পাঠকের সর্বশেষ সাক্ষাৎ। তৃতীয় খণ্ডে শুনি তার অপহরণ সংবাদ এবং অপূর্ব সাহস ও কৌশলে সেনাপতি জাফর খানকে হত্যা ও অন্তর্ধান। অতঃপর দীওয়ানা মজনূনের হা-হুতাশ ও তত্ত্বকথায় কাহিনীর যবনিকা। শব্‌নমের ভূমিকা সক্রিয় এবং প্রথম থেকেই ঘটনাপ্রবাহ ছিলো তারই নিয়ন্ত্রণে। উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে নায়িকার আকস্মিক অবলুপ্তি এবং তারই সন্ধানে মজনূনের বিক্ষিপ্ত বিচরণ ও 'সদাচারে' স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, লেখক যেন অসতর্ক মুহূর্তে এক ফুৎকারে আলোকবর্তিকাটি নির্বাপিত করে নিশ্ছিদ্র তমসায় তারই অন্বেষণে গলদঘর্ম।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যর্থতার স্মারক 'মজনূন' ও 'কীর্তিচৌধুরী'—যথাক্রমে শব্‌নম্ ও তুলনাহীনার নায়ক। সূত্রধরের আপ্রাণ প্রচেষ্টাও এই পুত্তলিকা দুটোকে সজীব সচল করতে পারেনি। যদিও দুটো উপন্যাসেই নায়কদ্বয়ের সক্রিয় হওয়ার পর্যাপ্ত অবকাশ ছিলো। এবং সে অবকাশ অপচিত অলস বাগ্‌বিন্যাসে।

প্রথমাবধিই মজনূন অতিমাত্রায় ভাগ্যনির্ভর। সদ্যপরিচিতার পাণিগ্রহণ ত্যাগে তার অক্ষমতা ইরানী কবির ছন্দে সান্ত্বনা খুঁজেছে :

কত না হস্ত চুমিলাম আমি অক্ষমালার মত,
কেউ খুলিলনা কিস্মতে ছিল আমার গ্রন্থি যত।

'দস্ত্-ই হর্-কস্‌রা ব্ সানে সবহৎ বুসীদম্ চি সূদ
হীচ্ কস্‌ন্ কশওদ আখির অক্‌দয়ে কারে মরা'।'
[শব্‌নম্, পৃ. ১৯]

এই নিষ্ক্রিয় চরিত্র তুর্কী-পাঠানীর বিপরীতে নায়ক হিসেবে সম্পূর্ণ অযোগ্য, বেমানান। এই বঙ্গসন্তানের ঐকান্তিক কামনা,—'আমি চেয়েছি ঘরের প্রেম, বধূর প্রেম—বঁধুর প্রেম আমি চাইনি। সংসারের অবহেলা অনাদরের মাঝখানে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বাড়ি ফিরলে আমি সেখানে সবচেয়ে আদরের ধন। . . .আমি হতে চেয়েছিলুম বাড়ির পিছনের ছোট্ট পুকুরটি। যেটি আমার বধূর, আমার নির্জনে পাতা সংসারের জননীর একান্ত আপন।' [শব্‌নম্, পৃ. ৫৯-৬০]। সে-সঙ্গে মনে পড়ে শব্‌নমের সকৌতুক রসিকতা: 'বা-ঙ্গা-লা মুল্লুক সেখানে তো শুনেছি পৃথিবীর শেষ। তারপর নাকি এক বিরাট অতল গর্ত।... সেখানে তাই রেলিঙ লাগানো আছে। পাছে কেউ পড়ে যায়। বাঙালীরাও নাকি তাই বাড়ী থেকে বেরয় না।' [শব্‌নম্, পৃ. ৫-৬]।

যে বিশেষ গুণটিতে মজনূন আকর্ষণ করেছে শব্‌নম্‌কে —তা' হলো তার কাব্যপ্রীতি। সে শুধু আদর্শ শ্রোতাই নয়, প্রকৃত বিদগ্ধ-জনের মতোই নায়িকার বয়েতের প্রত্যুত্তরে উৎকৃষ্টতর ছন্দ-গাথা উপস্থাপনে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একই গুণে সে মুগ্ধ করেছে 'জানেমন' এবং শব্‌নমের অশীতিপর গুরুকে। তার অবশিষ্ট নায়কত্বের ভিত্তি নায়িকার অনুগ্রহ ও বদান্যতা। শব্‌নমের অদর্শনে বিবশ মজনূন নামাজ-রোজা করে ধর্মীয় প্রথানুযায়ী 'স্বপ্নে সত্যপথ' নিরূপণে বিশ্বাসী। অপহৃত শব্‌নম্ উদ্ধারে তাঁর একমাত্র ভরসা 'পরম করুণাময়ের দয়া'। তদুপরি বাগাড়ম্বর ও আত্মম্ভরিতা চরিত্রটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। প্রথম পুরুষে লেখা উপন্যাসটিতে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে নানা মুখে আপন মাহাত্ম্যগাথা শুনিয়েছেন মজনূন বিনামে লেখক। অপহৃতা শব্‌নমের সন্ধানে ভৃত্য আবদুর রহমান পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত তখন দিবাস্বপ্নে বিভোর নায়ক: 'যেন . . . স্পষ্ট হতেও স্পষ্টতর দেখতে পাচ্ছি, আমি মায়ের এক জানুতে, শব্‌নম্ অন্য জানুতে বসে আছে আর মা কলাপাতার সামোসাতে মোড়া ধান-দুর্বা আমাদের মাথার উপরে রেখে আশীর্বাদ

করছেন।' এবং সম্বিতে ফিরে আসে 'মায়েরই পুণ্যবলে, তাঁরই আশীর্বাদের ফলে।' [শব্‌নম্, পৃ. ১৬০]। কখনো বা স্বপ্ন দেখে 'শব্‌নমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে' আছে। সম্ভবতঃ অনায়াসে, শুধুমাত্র কিস্‌মতের জোরেই 'অধরা'-কে পেয়েছিলো বলেই অন্তর্হিতা.ক পুনরায় ভাগ্যবলেই লাভ করতে চেয়েছে। ফলে তার পৌরুষও অপ্রকাশিত, অবদমিত ——আদৌ যদি তেমন কিছুর অস্তিত্ব তার মধ্যে থেকে থাকে। শব্‌নম্ নেই। নায়কের কর্তব্য ও স্তব্ধ। স্মৃতিচারণই তার সময় ক্ষেপণের উপায়। আর সৈয়দ মুজতবা আলী স্বরূপে আত্মপ্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। পাণ্ডিত্য সাওয়ার হয় নায়কের স্কন্ধে। এ' পর্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর চমৎকার আলোকসম্পাত করা হয়েছে। চরম মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও নায়কের ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং ঐতিহ্যপ্রীতির চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত। এতে লেখকের পাণ্ডিত্যের স্ফুরণ আছে, কিন্তু নায়ক চরিত্র বিকাশে সহায়ক হয়নি। শব্‌নমের বয়েতঃ

কাজী নই আমি, মোল্লাও নই, আমার কি দায়, বল!
শীরাজী খাইব, প্রিয়ার চুমিব ওই মুখ ঢলঢল।——

এর উত্তরে মজনূনের সংযোজন,——'তুমি পাশ ফিরে শুয়ে মৃদু হাস্য করবে। তখন তোমার গালের টোল হবে গভীরতম—আমি সেটিকে ভর্তি করব শীরাজী দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে——অতি ধীরে ধীরে সেই শীরাজী চুমোয় চুমোয় তুলে নেব।'——আমাদের উৎসাহিত করে। কিন্তু নায়িকার পদচুম্বনের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হস্ত সন্দর্শন কিংবা শব্‌নমের লেখা কবিতা পাঠে অশ্রুমোচনের সংবাদে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের পাঠক মনে নায়কচিত্তের ভারসাম্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। পুনরায় শব্‌নম্‌কে স্মরণ করতে হয়,——"মজনূন মানে তো পাগল। জিন্ যখন কারো কাঁধে চাপে তখন 'জিন্' শব্দের পাস্‌ট্ পার্টিসিপ্‌ল্ মজনূন দিয়েই তো পাগল বোঝানো হয়।" [শব্‌নম্, পৃ. ৬]।

শেষ পর্যন্ত অর্ধোন্মাদ——নায়কের জবানীতে——'শব্দার্থেই মজনূন' ——নায়িকার সন্ধানে মজার-ই-শরীফে উপস্থিত। এই প্রেম-পাগল এখানে আর অপরিচিত নয়। তার প্রতি শহরের সজ্জনদের অপ্রত্যাশিত সাহায্য—সহানুভূতিরও অভাব নেই। দরগা-শরীফে গিয়েও নামাজে গাফিলতির জন্যে তার প্রতি কোন অনুযোগ ওঠে না। খোদ্ নায়কের

ভাষ্য: " 'মজনূনে'র উপর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর-একদিন শুনেছিলুম বোরকা-পরা দুটি তরুণীর একজন আরেক জনকে বলছে, 'কী তোর প্রেম যে, তাই নিয়ে হর-হামেশা আপসা-আপসি করছিস্ ! ওই দেখ প্রেম কী গরল! শব-ই-জুফ্‌ফাফের [বাসর রাতে] ফুল শুকোবার আগেই এর প্রিয়া শুকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। হয়েছিস ওর মত তুই...মজনূন—পাগল?"৩২ কিংবা মজার-ই-শরীফের 'সমস্ত বাজার আমাকে দেখামাত্রই যে রকম হুলুধ্বনি দিয়ে উঠেছিল তা থেকেই বুঝেছিলুম বিখ্যাত বা কুখ্যাত হওয়া যায় নানা পদ্ধতিতে, এবং কোনও চেষ্টা না করেও।' [শব্‌নম্‌, পৃ. ২০০]। প্রেমোন্মাদ এতোটা সচেতন হতে পারে কী? নায়কের দম্ভী আত্মপ্রচারে চারিত্রটির বাস্তবতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বহুলাংশে ক্ষুন্ন।

উপন্যাসের শেষাংশে প্রেম-বহ্নিতে পূত পবিত্র হয়ে সর্বশুচিতা নিয়ে নায়ক চরিত্রের যেন নবজাগরণ—দীর্ঘ তপস্যান্তে সাধনায় সিদ্ধিলাভ! তার উপলব্ধি—'...আরবভূমির মজনূন তো... প্রেমের অমৃত খেয়ে পেয়েছিলেন দিব্যরূপ।' শব্‌নমের মজনূনও প্রেমের সোপান বেয়ে পৌঁছে গেছে আনন্দলোকে। মৃত্যুঞ্জয় প্রেম তাকেও করেছে 'মৃত্যুঞ্জয়ী'। সুতরাং এখন থেকে তার 'প্রতি মুহূর্তই শুভ মুহূর্ত'। এবং এখানে সুস্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত মধ্যযুগীয় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের আধ্যাত্মিক অনুভূতি। প্রচণ্ড আন্দোলনের অবসানে নায়কচিত্ত শীতের সরোবরের মতোই শান্ত, স্বস্থ, সমাহিত। এবং মওকা মেলামাত্রই জানেমনের সঙ্গে মেতে ওঠে বয়েৎবাজীতে। বিষপাত্র দানকারী কাতর শিষ্যের প্রতি সোক্রাতেসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে—জানেমনের শোকনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে স্মরণ করে ভারতের কবি আবদুর রহীম খান-ই-খানানের কবিতা :

রহীমন! তুমি বলো না লইতে অনাদরে দেওয়া সুধা—
আদর করিয়া বিষ দিলে কেহ মরিয়া মিটাব ক্ষুধা।

'রহীমন! হমে না সুহায় অমি পিয়াওৎ মান বিন্।
জো বিষ দেয় বোলায় মান সহিত মরিব ভালো॥'
[শব্‌নম্‌, পৃ. ২০৭]

অতঃপর মজনূন-ই দিলে তার অলৌকিক জ্যোতি লাভের সংবাদ। এবং সেই অনুভূতিবলেই যেন নক্ষত্র অরুন্ধতীর ভাষ্যে পেলো প্রত্যাশার

সান্ত্বনা: 'শব্‌নম্ আমারই মত তার বশিষ্ঠকে খুঁজে নেবে।' সর্বশেষ নায়িকার যে মূর্তি মজনূন গড়ে তোলে, তা' কবির কবিতা, প্রেমিকের প্রেম, মনোলোকে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার অপূর্ব প্রতিমা।---'আমার চারু-সর্বাঙ্গীকে গড়ার সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ। ...খাঁটি ভারতীয় ভাস্করের মত প্রতিমালক্ষণানুযায়ী মূর্তিটি নির্মাণ করে সর্বশেষে তার সম্মিলিত পদযুগলের দুই পদনখকণার উপর ধীরে ধীরে রাখতুম আমার দুই ফোঁটা চোখের জল। এই আমার বুকের হিমিকাকণা--শব্‌নম্।' [শব্‌নম্, পৃ. ২১৫]। পরবর্তী স্তরে মূর্তিনির্মাণের প্রয়োজনও লুপ্ত। কেননা, শব্‌নম্ তখন মজনূনের 'মনের মাধুরী, ধ্যানের ধারণা, আত্মনের জ্যোতি' এবং এই জ্যোতিই সন্ধান দেবে তার মানসপ্রিয়ার।

লেখক ক্রমান্বয়ে তাঁর নায়ককে বাস্তবলোক থেকে নিয়ে গেছেন ধ্যানলোকে। মজনূন অভীষ্ট লক্ষ্যে ক্রমশ: উর্ধ্বগামী এবং 'এর মধ্যেই কাঁটাবনকে নর্মকুঞ্জ বলে মনে হচ্ছে, কাদা-ভরা খালকে প্রাণদায়িণী স্রোতস্বিনী বলে মনে হচ্ছে। গিরি শিখরে পেঁছিলে সমস্ত ভুবন মধুময় বলে মনে হবে'----এই প্রত্যাশাতেই তার স্বস্তি এবং কাহিনীর প্যাথেটিক অনুভবেরও তারল্যপ্রাপ্তি। মোটকথা উপন্যাসের উপান্তে লেখকের পাণ্ডিত্য, তত্ত্বকথা, শাস্ত্রবচনের আড়ম্বর গ্রন্থটির বৈভবে পরিণত হয়নি এবং প্রায় তপঃসিদ্ধ সূফীতে উত্তীর্ণ নায়ককে সুস্থ মনে গ্রহণ করা আধুনিক কালের পাঠকের পক্ষে বিব্রতকর। এই মজনূন যেন কিংবদন্তীর মজনূঁর কালোপযোগী সংস্করণ। মজনূঁর মতো শব্‌নমের নায়কও শব্‌নম্‌কে তথা সৃষ্টিকে ভালোবেসে ঈশ্বরের নৈকট্য-প্রয়াসী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর প্রেমই বৃহত্তর প্রেমের সোপান।

মুজতবা-মানসে মা ও মাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুখে-দুঃখে আনন্দ-দৈন্যে সর্বাবস্থায় তাঁর সর্বসত্তা জুড়ে মা-জননী আর বাঙলার প্রাকৃতিক মাধুর্যে তাঁর দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন। ফলে তাঁর নায়িকার 'গালের টোল'-এ আবিষ্কৃত সিলেটের "ছোট্ট মনু-গাঙের দ' কিংবা 'কপোল বোলপুরের বসন্ত-কিংশুকের মত রাঙা।'

নায়ক-নায়িকা ব্যতীত উপন্যাসটিতে অন্য ভূমিকার উপস্থিতি নিতান্তই গৌণ। জানেমন, সর্দার আওরঙ্গজেব খান ও তাঁর গুরুর চকিৎ দর্শন দীপ্যময়। কাহিনীটি একমুখী হলেও গল্পের প্রয়োজনে

সংযোজিত লায়লী-মজনু কথা, বেদুইনকন্যা-প্রসঙ্গ কিংবা রাজা জনক ও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কাহিনীকে আলী সাহেব নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। একটি বর্ণনায় আফগানিস্তানের বিশেষ সামাজিক রূপ সুচিত্রিত।

> ...এ দেশের ডাকাত আর বণিকে তফাত কম। যে দুদিন পূর্বে বণিক ছিল সে কিছুটা পয়সা জমিয়ে ডাকাতের দল গড়েছে। আবার যে দুদিন পূর্বে ডাকাত ছিল সে কিছুটা পয়সা করে আজ পণ্যবাহিনী তৈরি করেছে এবং এর পরও অন্য এক শ্রেণীও আছে। এরা দুটো একসঙ্গে চালায়। পণ্য-বাহিনী নিয়ে যেতে যেতে সুযোগ পেলে ডাকাতিও করে।[৩৩]

চার হাজার বছরের প্রাচীন 'বাসর রাতি গীতি'র ভাবদ্যোতনা অপূর্ব। মুজতবা রচনাবলীর আনাচে কানাচে ছড়ানো-ছিটানো এমনি মুক্তারাজীর সংখ্যা নগণ্য নয়। শব্‌নমের সুরেলা কণ্ঠে প্রাচীন কথা-মালা যেন নবরূপে শরীরী মূর্তিতে আবির্ভূত:

> আমি তাকে নিয়ে যাব, আমার মায়ের বাড়িতে। মা আমায় শিখিয়ে দেবে। আমি তাকে পান করতে দেব সুগন্ধি মদিরা—আমারই ডালিম নিংড়ে বের করা রসের সুরভি মদিরা। তার বাম হাত রইবে আমার মাথার নিচে আর তার ডান হাত দিয়ে সে আমায় আলিঙ্গন করবে। আমার অনুরোধ, আমার আদেশ, অয়ি জেরুজালেমবালা-দল আমার প্রেমকে চঞ্চলিত কর না, তাকে জাগ্রত কর না, যতক্ষণ সে না পরিতৃপ্ত হয়। ...আমি তাকে নিয়ে যাব আমার মায়ের ঘরে—যে ঘরে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আমি তাকে পান করতে দেব আমারই ডালিম নিংড়ে—[৩৪]

শব্‌নম্ এবং শহ্‌র্-ইয়ারের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। 'দুয়েরই নায়িকা অসামান্যা। দুয়েরই নায়ক লেখক স্বয়ং, দুয়েতেই প্রেমের বেদনাময় কাহিনীর প্রাধান্য, দুয়েতেই রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য, রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে জীবনের ব্যর্থ সাধনার তাৎপর্য আর সান্ত্বনা অন্বেষণ; দুয়েতেই তত্ত্বালোচনার প্রাধান্য—ঈশ্বর বিশ্বাসীর সত্যান্বেষণের পরিচয় দানের প্রয়াস, দুয়েতেই শিথিল-গ্রথিত কাহিনীতে নায়কের

(ওরফে লেখকের) কথার নেশা মাত্রা ছাড়ায়।'[৩৫] —শহর্-ইয়ার সম্বন্ধে সর্বাংশে প্রযোজ্য হলেও বক্তব্যটিতে আলী সাহেবের অন্যান্য উপন্যাসের দুর্বলতাও সুপ্রকট। নিজে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাসে গুণগত সঙ্কট ঘনীভূত। এবং প্রজ্ঞা, নিরলস অধ্যয়ন, কাহিনী বর্ণনের অপূর্ব ভঙ্গিমা এবং সর্বোপরি অননুকরণীয় রচনাভঙ্গী ও সুচয়িত শব্দাবলীর দীপ্ত প্রভা তাঁকে সঙ্কটমুক্ত রেখেছে। 'শব্‌নম্' তো ভাষার ইন্দ্রজাল—সম্মোহন মন্ত্র।—৺প্রমথনাথ বিশীও যার মোহমুক্ত হতে পারেনি। প্যাথেটিক্ অনুভূতির এমন আবেগ-ফেনিল রূপ বাঙলা সাহিত্যে বিরল। এ' আবেগে ভেসে গেছেন সমকালের প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই। 'শব্‌নম্ উপন্যাস পড়তে পড়তে যে অনবরত চোখের জল মোছে না, সে পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৩৬] শব্‌নম্-এর মায়াপাশে আবদ্ধ সাধারণ পাঠকের আশাভঙ্গের ফরিয়াদ শুনি 'শহ্‌র্-ইয়ার'-এর আত্মপ্রকাশে,—"বিশ্বাস করতেও মন চায় না যে 'শব্‌নম্'-এর লেখক কোনোদিন বৃদ্ধ হতে পারেন, তাঁরও প্রতিভায় ভাঁটা পড়তে পারে।"[৩৭]

সমালোচকের নির্মম ছুরিতে ব্যবচ্ছেদের পরও 'শব্‌নম্' ভাবিত করে—কোন্ মোহনীয়তায় সর্বশ্রেণীর পাঠক আবিষ্ট? শব্‌নমে তাদের প্রত্যাশা কতোটুকু পরিপূর্ণ? পুস্তকটির জাত নিয়ে আমরাই প্রশ্ন তুলেছি। সদুত্তর মেলেনি। শুধু মনে হয় 'শব্‌নম' বিরহ-গাথা, প্রেমিকের উষ্ণশ্বাস, যৌবনের স্বপ্ন—নৈরাশ্যের অনিশ্চয়তায় ক্ষীণ প্রত্যাশা! এবং খোদ্ আলী সাহেবের দিলাশা: 'শব্‌নমের অনন্ত তারুণ্য তো কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না—তাকে তো আমি গড়েছি আমার জিগর কলিজার বিন্দু বিন্দু খুন্ দিয়ে এবং সি নির্মাণ বহু শত যোজন পেরিয়ে এখনো পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী।'[৩৮]

০৪. সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাসের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। এবং সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে সেগুলোর আত্মপ্রকাশ। পুস্তকাকারে প্রথমটি ১৯৫৪-তে এবং পরবর্তী তিনটি যথাক্রমে ১৯৬০, '৬৯ ও '৭৪-এ প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রাপ্তির পূর্বে প্রথম তিনটির 'দেশ' পত্রিকায় ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ এবং চতুর্থটি একসঙ্গেই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত। 'অবিশ্বাস্য'-এ সার্থক ঔপন্যাসিকের মনোবিশ্লেষণী দৃষ্টি এবং 'শব্‌নম্' এ রোমান্সের তন্ময়তা। 'শহ্‌র্-ইয়ার'-এ এ'দুটোর মধুর সম্মিলন

ও সমন্বয় এবং তখনো বহুজন 'শব্‌নমাচ্ছন্ন'। আবার অনেকে 'শহ্‌র্-ইয়ার'-এ নবতর আস্বাদের সন্ধান পেয়ে উৎসাহে উদ্বাহু। আর দু'পক্ষে উপভোগ্য 'কবির-লড়াই'-ও বেশ জমে উঠেছিলো।

ধারাক্রমে প্রকাশকালে 'শহ্‌র্-ইয়ার'-এ 'মুজতবা আলীর অসাধারণ দ্যুতিময় বাক্‌শিল্প'-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে জনৈক আশাহত পাঠকের ফরিয়াদ, 'শব্‌নম্'-এর লীলায়িত ভঙ্গিতে, হেলানো, বাঁকানো, মোচড়ানো ভাষার সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে কবিত্ব শক্তির যে অবিরল প্রশ্রয় আছে বা চাচা-কাহিনীর সেই আশ্চর্য ভাষা...তার কতটুকু আজ অবশিষ্ট সৈয়দ সাহেবের লেখায়?...বাক্যের যে ইন্দ্রজাল আলী সাহেবের রচনাগুলিকে আচ্ছন্ন করে আছে ১৩৭৩ পর্যন্ত তা যেন হঠাৎ রঙিন কথার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।"[৩৮ক] একই সংখ্যায় অপর পত্রে কানপুর থেকে শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী 'শহ্‌র্-ইয়ারের মত...একটি নারী চরিত্র' সৃষ্টির জন্যে 'শব্‌নম্ চরিত্রের স্রষ্টার কৃতিত্বকে' অভিনন্দিত করেন। এঁর বক্তব্যের সমর্থনে এবং শহ্‌র্-ইয়ারের ভাষার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে অপর পাঠক রবীন্দ্রনাথের চারটি রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনা---ব্যঙ্গ--কৌতুক, তোতাকাহিনী, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম এবং পঞ্চভূতের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তার প্রত্যেকটিতে হাস্যরস রয়েছে। তবু তাদের ভাষার পার্থক্য বিপুল। আর যেখানে দুটি লেখার [শব্‌নম্ ও শহ্‌র্-ইয়ার] বিষয়বস্তুর আসমান-জমিন ফারাক, সেখানে ভাষাগত বিরোধ ততোধিক।' অতঃপর অভিমানে স্মরণ করিয়ে দেন, 'আপনি ... চাচা-কাহিনী---শব্‌নমের ভাষার ··· প্রশংসা করেছেন, আলী সাহেব তো সে ভাষার জন্যে সারা লেখক জীবন ধরে নিন্দিত হয়েছেন।...এবার মুজতবা শুদ্ধতর বাংলা লিখেছেন। আরও দু-চারটে লেখা বেরোক, দেখা যাক, শুদ্ধ বাংলায় লেখাতে আগের মতোই তিনি জেল্লা দিতে পারেন কিনা, অথবা ফের আগের ভাষাতে ফিরে যান নাকি। যাই করুন না কেন, ইতোমধ্যে লেখকের ভাষায় শুদ্ধতা আনার প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়।'[৩৯]

বৈরী সমালোচনার বিপক্ষে জনৈকা মাধুরী চৌধুরীর সবিনয় নিবেদন, 'বাংলাদেশের অভিজাত মুসলিম ঘরের একটি বধূ---শালীনতায়, সম্ভ্রমে, তেজস্বিতায় যে অতুলনীয়া, রবীন্দ্রনাথের গানের অমৃতধারায় যার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ, সংস্কারের বন্ধন ও ঐশ্বর্যে

যে একান্ত বিমুখ সেই "শহ্‌র্‌-ইয়ার" সৈয়দ সাহেবের "শব্‌নমের" চাইতে কোন অংশে কম নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিকায় এই দুই দীপ্তিময়ী নারীর আনাগোনা।...আলী সাহেবের প্রত্যেকটি রচনা প্রত্যেকটি থেকে আলাদা। তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের, হিন্দু-মুসলিম-খৃীস্টীয় ভাবের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর রচনাতে প্রতিফলিত। নানা ভাষার ভাণ্ডার থেকে নানা শব্দের মণিমাণিক্য চয়ন করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলির ভিতর দিয়ে। "শহ্‌র্‌-ইয়ার" তাঁর অন্য ধরনের সৃষ্টি। এতে নূতন নূতন শব্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। হয়েছে একটি নূতন ভাবধারার। প্রচুর বিলাস বৈভবে পালিতা এবং প্রাচীন আদব-কায়দার বেড়াজালে আবদ্ধ একটি নারী—যার মুক্ত মন চায় সংসার-সীমার বাহিরে কোন আশ্রয়। "শহ্‌র্‌-ইয়ারের" ভিতর পাই একটি বৈরাগ্যময় হৃদয়—সূর্যমুখীর মতো যে চেয়ে আছে পরম শান্তিময় ঈশ্বরের পদপ্রান্তে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত তাই সে অনন্যা।'৪০

উপন্যাসটির প্রকাশকালে লেখক প্রচুর চিঠিপত্র পেয়েছেন। তাতে ছিলো উৎসাহ-অভিযোগ-অনুযোগ, উপদেশ-নির্দেশ। অন্যতম অভি-যোগ, তাঁর মাত্রাধিক রবীন্দ্রানুগত্য। বাদ্‌বিতণ্ডা সযত্নে পরিহার করাই ছিলো মুজতবা আলীর নীতি। অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা সুধীজনের পত্রোত্তরে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন কালেভদ্রে। এই পর্যন্ত। প্রথম পর্বে * আমরা আলী সাহেবের উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং মিলনমুখী মানবীয়তার সদৃষ্টান্ত পর্যালোচনায় এ'প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। "শহ্‌র্‌-ইয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ কিংবা জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি শহ্‌র্‌-ইয়ারের পত্রে তারই জবানীতে দিয়েছেন। কখনো লেখকের অভিমান চরিত্রকে অতিক্রম করে গেছে। যথা নায়িকার উক্তি:

> ঐ তো আমার 'দোষ'। কোনো-কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসন নেন রবিঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপাণি আসন জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন। আর লোকে ভাবে—হয়তো ঠিকই ভাবে—আমার নিজস্ব কোনো ভাব-ভাষা নেই, আমি "চিত্রিতা গর্দভী"—রবিকাব্যের গামলার নীলরঙে আমার

---

*'সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি'

ধবলকুষ্ঠের মত সাদা চামড়াটি ছুপিয়ে নিয়ে নবজলধরশ্যাম কলির মেকি কেষ্ট হয়ে গিয়েছি ![৪১]

'শহ্‌র্‌-ইয়ার' প্রসঙ্গে মুজতবা আলী ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও রসবোদ্ধা-সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায়ের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিলো। শহর্‌-ইয়ারের পত্রে তাঁর প্রশ্নের সমাধান পেয়ে ৺রায় আলী সাহেবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ লেখনে উল্লেখ করেন,—

'আমি আপনাকে বলতে চাইনি যে আপনি রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকারক; বরং রবীন্দ্রনাথ যেখানে হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই যেন অতি অন্তর্পণে আলগোছে এড়িয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ, নিরপেক্ষ এক অন্য উদার সমাজ বা সেইরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের কাছে দিয়েছেন, সেখানে আপনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আপনার সুন্দর লেখার মাধ্যমে যে একটি মিলনসেতু বা ঐক্য আনতে সক্ষম, এখানেই আপনার রচনার বৈশিষ্ট্য;...রাজনৈতিক ও ধার্মিক নানা সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও শক্তির বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের এই প্রয়াস বীরত্বপূর্ণ ও অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে তোলার এক মহৎ ব্রত। আমি আনন্দিত যে, আপনি এ বিষয়ে সফলতা লাভ করেছেন। এ জন্য আপনার সত্যিই উচ্চ পুরস্কার প্রাপ্য। আপনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাবার যোগ্য।...আপনি যেন একটু ক্ষুন্ন হয়েছেন। তাই লিখেছেন "লোকে ভাবে, হয়তো ঠিকই ভাবে, আমার নিজস্ব কোনো ভাব ভাষা নেই" ইত্যাদি। কিন্তু কোনো কিছু নির্বিচারে গ্রহণ করলেই কি তার মূল্য বাড়ে? ...রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। আমি তো হৃদয় খুলেই বলতে চাই আপনার কৃতিত্ব অনন্য। বিশেষ করে রূপকথার মতো সামান্য হাতিয়ার সম্বল করে, যেখানে বহু বিরুদ্ধ শক্তি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। মহৎ সাহিত্যের ভিতর একটা কল্যাণকারী উদ্দেশ্য থাকে, তা মার্কসিস্ট না হয়েও বোধ হয় বলা চলে; সেটি হল মানুষের ভালো কিসে হয় তার অনুসন্ধান করা এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞানের উদ্দশ্য ও মহৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য একই।

...কিছুকাল আগে আমার মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির যুগে শিল্পের যাদু স্তিমিত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে। একটি বইতে এই Magical quality-র অভাবজনিত আধুনিক সাহিত্যের

নিস্ফল বন্ধ্যাত্বের বিষয়ে একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম; তাই, আপনার লেখায় সেই যাদুর স্পর্শ পেয়ে আমি হৃষ্টচিত্ত হয়ে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম। আপনি যে অনেকের প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করেন, তা আপনার নিজস্ব গুণেই। আমার সেলাম নেবেন।

...নিশ্চয়ই আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে ঋণী, তবু ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথকে নতুন আলোতে আবার দেখতে। আপনার লেখার মধ্যে যে একটি পরিহাসের সুর আছে, লেখাকে উইট-এর মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল শাণিত করে তুলতে যে চেষ্টা, তা বার্নাড শ-এর লেখায় মধ্যে পাই। সম্ভবত, সেই সুপারম্যানই আপনার লক্ষ্য।'[৪২]

সৈয়দ মুজতবা আলী চরিত্র সন্ধানেও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা য়ুরোপীয় এবং খৃস্টান, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মুসলমান এবং চতুর্থটির হিন্দু। শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থেই কোন না কোন রূপে 'শেষের কবিতা'র রেশ অনুরণিত। এবং চতুর্থটি মুজতবার সর্বাধিক অনুজ্জ্বল অবদান।

বোলপুর থেকে শেয়ালদা যাবার পথে ট্রেনে মুজতবা-সৃষ্ট অনন্যা নায়িকা শহর্-ইয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূচনা। যেচে নায়িকা শুধু নিজেই লেখকের সঙ্গে পরিচয় করেনি, তার ডাক্তার স্বামী জুলফিকার আলী খানের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয়। পরিচয়ের এই সূত্র ধরেই মুজতবার একনিষ্ঠ ভক্ত-পাঠিকা তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানায়। বিনা আমন্ত্রণেই স্বামী-স্ত্রী লেখকের শান্তিনিকেতনের নিবাসে উপস্থিত হয়। কখনো শহর্-ইয়ার একা। লেখককে সাদরে নিয়ে যায় নিজ বাড়ী। বিলাস প্রাসাদের বাসিন্দা একটিমাত্র দম্পতি। বিদগ্ধা এ নারী অসাধারণ এবং আপন অধিকারবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ধর্ম বিষয়েও তার চিন্তাভাবনা অতিশয় স্বচ্ছ। শহর্-ইয়ারের স্বামীর আসক্তি 'নমাজ-রোজা আর রিসার্চ'-এ। আর আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তার নিজস্ব উক্তি,——'আমার বদ্-নসিব। আল্লা আমাকে সেদিকে মতিগতি দেননি।' লেখকের প্রশ্নে তার প্রত্যয়ী জবাব, 'আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত।' তার বিড়ম্বনা সম্ভবতঃ নিঃসঙ্গতা এবং তথাকথিত আভিজাত্যের ট্রাডিশনে বন্দী জীবন। অকৃত্রিম ভালোবাসা সত্ত্বেও রিসার্চ-অন্তপ্রাণ স্বামী তার অভাব মোচনে সম্পূর্ণ অপারগ। শহর্-ইয়ারের

আতিথ্য গ্রহণ করে এ'-দম্পতি ও পরিবার সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে এঁদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য, নিয়ম-রীতি। ডাক্তার খানকে বিস্ময়চকিত করে লেখক শহর্ ইয়ারকে নিয়ে তাঁর গবেষণাগারে উপস্থিত হলে ডাক্তার তাঁদের নিয়ে দিল্লীবাসী উর্দুপ্রেমী বন্ধু মনসূর মুহম্মদ এবং বেগম মনসূরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়। মনসূর-শহর্-ইয়ারের বাক্‌যুদ্ধের মাধ্যমে সে-সময়ের বহু বিতর্কিত ও বহুল আলোচিত উর্দু-বাঙলা প্রসঙ্গও উঠে পড়ে। শহর্-ইয়ারের কণ্ঠে মাতৃভাষা বাঙলা সম্বন্ধে লেখকের অভিমত সুস্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে। এবং এ বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিদগ্ধা নায়িকার সূতীক্ষ্ণ মনন-মানসিকতারও চারু প্রকাশ।

পরবর্তী স্তরে কাহিনীর পট সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। শহর্-ইয়ার আমূল পরিবর্তিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আর তার প্রাণে সাড়া জাগায় না। সে 'পীরের' শরণাগত। এবং সেখানেই অতিবাহিত তার অধিকাংশ সময়। গভীর রাতে 'জিকের'----আল্লার এবাদতে থাকে নিমগ্না। লেখক আবিষ্কার করলেন, পীরটি তাঁরই প্রাচীন দিনের সখা সত্যান্বেষী আমীনুর রশীদ মজুমদার। পীরই জানালেন, শহর্-ইয়ার তাঁর কাছে আসে, কিন্তু তার কোন প্রত্যাশা প্রকাশ পায়নি।----এমন কি কোন জিজ্ঞাসাও নয়। ঘটনাচক্রে পীরের মোকামে পূর্ব-পরিচিত ভূতনাথ খান ও লেখককে শহর্-ইয়ারের অন্যতর রূপ---'ব্যক্তিত্ব' শব্দে যার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশিত হয় না----খানের ভাষায় 'অগ্নিশিখা'র পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। এবং শহর্-ইয়ারের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধার উৎসার লক্ষণীয়। অনেকটা যুক্তিতর্ক, কিছুটা নারী-মনস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আলী সাহেব তাঁর নায়িকার মনোজগতের অনালোকিত গলিপথের সন্ধান দানের চেষ্টা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নায়িকার দীর্ঘ পত্রের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি---অনেকটা 'অবিশ্বাস্য'-র মতোই। নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা, ট্রাডিশনের কারাগারে আবদ্ধ শাহ্‌র্-ইয়ার মুক্তালোকে বিচরণের অদম্য কামনায় মুক্তিসন্ধানী। এমন কি একনিষ্ঠ স্বামী, সংসার ছেড়ে অনির্দেশ্যের উদ্দেশেও পাড়ি জমানোর খেয়াল ছিলো। সম্ভবতঃ তার জীবন-যৌবনের চড়ায় ছিলো মাতৃত্বের বুভুক্ষায় তৃষ্ণার্ত এক নারী।

সর্বশেষ দৈবদুর্ঘটনা এবং বহুপ্রতীক্ষিত অনাগত সন্তানের পদধ্বনি তার জীবনের দ্বন্দ্ব-সমস্যা নিরসনের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডে ট্রাডিশনের আখড়া, আভিজাত্যের পাষাণ দুর্গ ভস্মীভূত এবং শহ্‌র্-ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা——এই তথ্য জানিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গেই ডাঃ জুলফিকার আলী সস্ত্রীক সুইডেন যাত্রার সংবাদ লেখকের গোচর করলে আলী সাহেব শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধু শুধিয়েছিলেন, "আবার দেখা হবে তো?" অস্ফুট কণ্ঠের উত্তর, "কী জানি, কী হবে?" কাহিনী মিলনান্তক হলেও নায়িকা রহস্যের আড়ালেই যেন অনেকটা আত্মগোপনের প্রয়াস পেয়েছে এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব উজ্জীবিত রেখেই গ্রন্থের যবনিকা।

'শহ্‌র্-ইয়ার' শুধুমাত্র নায়িকা প্রধানই নয়, প্রকৃতপক্ষে এ' উপন্যাসে কোন নায়ক চরিত্রের অস্তিত্বই নেই। স্বামী রঙ্গ-মঞ্চে এসেছে ভূত-নাথাদি উটকো চরিত্রের মতোই। আর লেখক শহ্‌র্-ইয়ারের পরিচয় জ্ঞাপন তথা তার চরিত্রবিশ্লেষণের অবকাশে আপন কথা বলে গেছেন। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। তাঁরই সহায়তায় আমরা শহর্-ইয়ার চরিত্রের স্তরবিন্যাসগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থন হয়েছি এবং এতোটুকু ভিত্তির ওপর নায়ক চরিত্রের প্রতিষ্ঠা চলে না। তবু কেউ যদি উপন্যাসে উপস্থিত চরিত্রের মধ্য থেকে একজনকে নায়ক হিসেবে দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে অবশ্য লেখককেই সেই সম্মান দিতে হয়। "লেখক এই অসামান্যা নায়িকার জীবনের চারটি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে বাঙালী মুসলমান ঘরের মেয়ে অবরোধ ভেঙে কলেজে লেখাপড়া শিখেছে। দ্বিতীয় স্তরে সু-গৃহিণী, সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী, রবীন্দ্র-রসিকা; স্বামী থাকলেও সঙ্গিহীনা। তৃতীয় স্তরে পীরশরণাশ্রিতা। পরিণতি চতুর্থ স্তরে—বিদেশযাত্রিণী অন্তঃসত্ত্বা নারী।"[৪৩]

শবনমের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ পাকেচক্রে, নির্জনে। আর শহ্‌র্-ইয়ার মুজতবা আলীকে আবিষ্কার করেছে ট্রেনে, জনতার মধ্যে। একজনের জন্ম প্যারিসে, স্বাধীনতার হাওয়ায় প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ। পারিবারিক- সামাজিক নিয়মরীতির ঐতিহ্যিক বন্ধনে অপরের জীবন সীমাবদ্ধ। দু'জনেই শৈশবে মাতৃহীনা। অবাধ মুক্তির আনন্দে শব্‌নম্ চঞ্চলা প্রজাপতি, ট্র্যাডিশনের পাষাণ নিগড়ে শৃঙ্খলিত শহর্-ইয়ার

বন্ধন-মুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুলা। দেশজ সংস্কৃতি দু'জনেরই রক্তে স্পন্দিত। 'খয়েৎ' শব্‌নমের জীবন-ছন্দ। শহর্‌-ইয়ারের রসনায় রবীন্দ্রনাথ। শব্‌নম্‌ 'বন-মল্লিকা: পাপড়ির মত'—পাগমান পাহাড়ের 'ভাজিন 'স্নো'. আর শহর্‌-ইয়ার 'অপূর্ব সুন্দরী' না হলেও 'তার সৌন্দর্যের অপূর্বতা আছে', অনেকটা লেখকের 'মা-বোনদের' মতো। শব্‌নম কিছুটা অনির্বচনীয় কল্পলোকবাসী, তুলনায় শহ্‌র্‌-ইয়ার মাটির কাছাকাছি। দু'জনেই শিক্ষিতা, অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং সংবেদনশীলা। তবে শহ্‌র্‌-ইয়ার "গতানুগতিক অর্থে শিক্ষিতা নয়; এ মেয়ে বিদগ্ধা এবং এর কল্পনাশক্তি আছে। দিন-যামিনীর অষ্টপ্রহরের প্রত্যেকটি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে তার থেকে কি করে আনন্দ-রস বের করতে হয়" সেটা তার অজানা নয়। তার প্রতিটি সংলাপ বিদ্যা-বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের স্ফুরণে ঝলমল। সে নিঃসংশয়, 'বুদ্ধির জিনিস বোঝানো তেমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু অনুভূতির জিনিস অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে শুধু আর্টিস্ট—সেও বহু সাধনার পর।'[৪৪]

বাঙ্‌লা সাহিত্যের সংবাদ যেমন রাখে তেমনি সামাজিক সমস্যা বিশেষতঃ মুসলমান নারীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত-প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল শহ্‌র্‌-ইয়ার। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকেই সে জেনেছে বাঙালী নারীর সীমাবদ্ধতা। সামাজিক, পারিবা-বারিক ও ধর্মীয় কারণে যে বাঙালী মুসলমান মহিলা প্রতিবেশী হিন্দু মহিলার চেয়ে 'সুপেরিয়র নয়', কিন্তু 'ডিফরেন্ট'—এ'কথাটা সে বোঝাতে চেয়েছে এবং বাহ্যদৃষ্টিতে 'ডিফরেন্ট' ভাবটি দৃষ্টিগ্রাহ্য না হওয়ার কারণ পরাধীনতা। "পরাধীন অবস্থায় মানুষে মানুষে পার্থক্য কমতে থাকে ; স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয়। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে এ দেশের হিন্দু মুসলমান রমণী উভয়ই ছিল স্বাধীনতালুপ্ত হারেমবদ্ধ। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুই-ই এক।" [শহ্‌র-ইয়ার, পৃ. ২৬]। প্রাপ্ত স্বাধীনতায় তাদের চিন্মুক্তি ও পার্থক্যের দৃষ্টান্ত শহ্‌র্‌-ইয়ার স্বয়ং। এই রমণী একই সঙ্গে সুগৃহিণী, মমতাময়ী বধূ এবং সহৃদয় সঙ্গিনী। লেখক এবং নায়িকার অভিন্ন রুচি পরস্পরের নৈকট্য লাভে এবং বিশেষ করে শহ্‌র্‌-ইয়ারের চিত্তোন্মেষের সহায়ক হয়েছে। তার নিঃসঙ্গতা ও অনুক্ত বেদনার পরিপাটি রূপটি সার্থকতার সঙ্গে উন্মোচিত। তাঁর

'আত্মার খাদ্য' 'জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত'।—তার "দিল্ তার জান্, তার সবকিছুর এমারত দাঁড়িয়ে আছে...রবীন্দ্রনাথের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর।" [শহ্‌র্-ইয়ার, পৃ. ১৪৭]। নায়িকার ভাষ্যে—"আমার সুখ-দুঃখের অনুভূতি, আমার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের অশ্রুপাত আনন্দোল্লাস আমার সর্বপ্রকারে সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শ-কাতরতা----সব, সব নির্মাণ করেছে, প্রাণবন্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান;" এবং যে ধর্মসঙ্গীতটি শহ্‌র্-ইয়ারের "হৃদয়ের ভিতর দুরন্ত তুফান তোলে, সেটি—

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দোসরা তো কোঈ নহী রে—

চরম অসহায় অবস্থায় এ-ভজনটি যে আমি কত সহস্রবার কখনো চিৎকার করে এই নির্জন বাড়ীতে গেয়েছি, কখনো গাড়িতে বসে গুন-গুনিয়ে, আর সবচেয়ে বেশী জনসমাজে----বস্তুত সেখানেই আমি সবচেয়ে বেশী একা, বর্জিতা, অসহায় শক্তিহীনা বলে নিজেকে অনু-ভব করি----নিঃশব্দে শুধু হৃদপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে।" [শহ্‌র্-ইয়ার, পৃ. ৭০-৭১]।

কেন এই নিঃসঙ্গতা? কিসের অপূর্ণতা? তার বক্তব্যে সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে, রয়েছে বন্ধনমুক্তির আকুলতা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্মরণে তার উক্তি----"...ঐ যে 'বন্ধ ছিলাম অন্ধকূপে'----আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি তাই নয়? অন্ধকূপের দেয়ালে জীবনভর করে যাচ্ছি মুষ্ঠ্যাঘাত আর আর্তনাদ", "ওগো খোলো খোলো, আমাকে আলো-বাতাসে বেরুতে দাও।" সম্মান-সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণতার মধ্যেও নিঃসীম শূন্যতায় এ'নারী নিঃশেষিতপ্রায়। অন্তর্লীন বেদনায় জীবন দুঃসহ। কিন্তু এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। তার ঋজু চরিত্রের ক্ষণপ্রভা বিকীর্ণ দিল্লীওয়ালা মনসূর মুহম্মদের সঙ্গে উর্দু-বাঙলার বিতর্কে। লেখকের দৃষ্টিতে আমরা তার মাধুর্যময়ী রূপ দেখিছি আর অপরিচিতের দৃষ্টিতে এ'নারী---'অগ্নিশিখা', 'জ্বলন্ত মশাল'! পরবর্তী পর্যায়ে শহ্‌র্-ইয়ারের যে উত্তরণ, তাকে রূপান্তর না বলে জন্মান্তর বলাই অধিকতর সঙ্গত। পরিচিত ভুবনের গণ্ডী ছিন্ন করে পীরশরণা-গতা নোতুন রূপে আবির্ভূতা। নবরূপার রহস্যময়তায় লেখকও

সংশয়াপন্ন। তার অন্তর্দহনে যেন বিপ্লবের জন্ম। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতও তার 'বুকের ভিতরে কোনো সাড়া' জাগায়নি। যদিও 'খঞ্জনি-হাতে বোষ্টমি, একতারা-হাতে বাউল, সারেঙ্গী-হাতে ফকীর' তার বুকে বারংবার আঘাত করে গেছে, আন্দোলিত করেছে হৃদয়মন। এর কারণ শহর্-ইয়ার উল্লেখ করেছে---'এদের...সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব অলঙ্কারবিবর্জিত ভক্তিগীতি মাঝে মাঝে আমার বুকে সাড়া জাগিয়েছে, এমনকি তুফান তুলেছে,---তার কারণ, অন্ততঃ আমার মনে হয়, এদের অভাবের অন্ত নেই, এরা গরীব-দুঃখী অনাথ-আতুর। খুদাতালা ছাড়া এদের অন্য কোনো গতি নেই। তাই এদের গীতে থাকে আন্তরিকতা, ডীপেস্ট সিনসিয়রিটি। ...সর্ববিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ তো এই হতভাগাদের একজন নন। তিনি তো অনাথ-আতুর নন। তাঁর ভক্তিগীতিতে ওদের মর্মান্তিক ঐকান্তিকতা সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের সুর বাজবে কি করে?'[৪৫]

পীর সাহেবের কাছেও শহর্-ইয়র এক বিস্ময়, ব্যতিক্রম। পীরের নিকট তার কোন কাম্য নেই, প্রশ্ন নেই, এমন কি শাস্ত্রালোচনায়ও অনাগ্রহী। আপন মনের অতি সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে সে অপেক্ষা করে থাকে। কেউ না কেউ সে-সব প্রশ্ন পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেই এবং তখন সে-ও উত্তর পেয়ে যাবে। পীরের অলৌকিক ক্ষমতায়ও সে অন্ধবিশ্বাসী নয়। তারই আগ্রহে ভূতনাথের ঠাকুরমা হিমালয়ে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার সন্ধানে আসে পীরের মোকামে। কিন্তু শহর্-ইয়ার তাঁকে সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলো, "পীর সাহেব আপনার ভাইকে হিমালয় থেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসবেন না। কিন্তু আমি আশা রাখি, তিনি আপনাকে কিছুটা মনের শান্তি এনে দিতে পারবেন---আল্লার কৃপায়।" [শহর্-ইয়ার, পৃ. ২১৫]।

বিবিধ সমস্যা, নানা প্রশ্নের মুখোমুখি করে মুজতবা আলী অতি সযত্নে নির্মাণ করেছেন তাঁর অসাধারণ রহস্যময়ী নায়িকা শহর্-ইয়ারকে। অতঃপর নায়িকার সুদীর্ঘ পত্রে তার ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডি, নিঃসঙ্গ বন্দীজীবনালেখ্য উদ্ঘাটিত। 'শহর্-ইয়ার-এর এই বিশ্লেষণমূলক দীর্ঘপত্র তার জীবনের টেস্টামেন্ট।'[৪৬] তীব্র আত্মদহনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের সীমানা ভেঙে ঘর-সংসারের গণ্ডী ছেড়ে অনির্দেশ্যের পথেই সে সমাধান খুঁজেছে। তার সমস্যা : 'পুরুষ মানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে

পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে?' শহর্-ইয়ার নিজেই কি বুঝতে পেরেছে? রবীন্দ্রাশ্রয়ে তাকে পুনরায় উচ্চারণ করতে হয়,——

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।'

... ... ... ... ...

অসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আমি এখনো ঠিক ঠিক জানিনে, 'আমার কিসের ব্যথা'. আমার অভাব কোনখানে, যার ফলে বিলাস---বৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন আমাকে অশান্ত করে তুলেছে।' [শহর্-ইয়ার, পৃ. ২৩৯]।

পত্রটি শহর্-ইয়ারের শূন্য জীবনের হাহাকার। স্বামীর সোহাগ-ভালোবাসায় মন তার পরিপূর্ণ। কিন্তু জীবন অপূর্ণ এবং স্বামীকেও পায়নি। সেখানে সপত্নীর মতো অচলায়তন সৃষ্টি করেছে ডাক্তারের রিসার্চ। শূন্য পুরীতে, শূন্য অঙ্কে রাজপ্রাসাদের যক্ষী কিংবা প্রাণহীন ঐতিহ্যের রক্ষিণীও হতে চায়নি সে। এবং একাকীত্বের এ' অনুভূতি একদিনের আকস্মিক সৃষ্টি নয়। যদিও দাম্পত্যজীবনের দশ-দশটি বছর কাটিয়ে তাকে লিখতে হয়েছে, 'প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আমাকে দিয়েছে জ্যান্ত গোর বিরাট ইঁট-সুরকির এই বাড়িতে। বধূ হয়ে যে সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে সির্ শির্ করেছিল, ...এরা...সবাই সর্বক্ষণ চিৎকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে, "ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! ঐতিহ্য! ঐতিহ্য!!" এবং এই 'ট্র্যাডিশনের' রূপনির্দেশেও আবার রবীন্দ্রনাথ:'...সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন; "বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল 'তুমি গেলে আমাদের কি দশা হবে।' দেবতা দয়া করে বললেন..."লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।" ...সেই ভূতই হলো ট্র্যাডিশন।' [শহর্-ইয়ার, পৃ. ২৬১]। সম্ভবতঃ এই ভূতের' 'আলিঙ্গন-মুক্ত হওয়ার জন্যেই শহর্-ইয়ারের ধর্মাশ্রয় এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যে দ্বিধাহীনতা।

পত্রের বিষয়বস্তুর আকস্মিকতায় বিমূঢ় লেখককে সচকিত করে সস্ত্রীক ডাক্তারের আগমন এবং মাত্র তিনটি বাক্যে বিপর্যয়-মুক্তির উচ্ছ্বাস :

"নাম্বার ওয়ান : আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।
নাম্বার টু : আমরা আগামী কাল যাচ্ছি সুইডেনে।···

নাম্বার থ্রী: ...শহর্-ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা।"
[শহর্-ইয়ার, পৃ. ২৬৮-৬৯]

দৈবানুগ্রহে 'কারামুক্ত' শহর্-ইয়ার স্বামী সান্নিধ্যে বিদেশগামিনী। শেষ মুহূর্তটি অনেকটা নিরুত্তাপ, সংশয়ের প্রলেপে উত্তেজনাহীন। "আবার দেখা হবে তো?"----লেখকের জিজ্ঞাসায় চেনা লোক থেকে অচেনালোকে যাত্রার প্রাক্কালের সংশয় নিয়ে শহর্-ইয়ারের অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত-----"কী জানি, কী হবে।"

"জীবন অনন্ত রহস্যময়---কে জানে কী হবে?-----'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/সম্মুখে ঘন আঁধার/পরে আছে কোন দেশে? /...হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।/পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে।' উপন্যাসের নায়িকার জীবনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতো সার্থক ব্যবহার আমার জানা নেই।"[৪৬] ---আমাদেরও!

ধর্মভীরু ডাক্তার জুলফিকার সজ্জন, প্রেমিক এবং রিসার্চ-অন্তপ্রাণ। শহর্-ইয়ারের ভাষ্যে 'দুটি মাত্র ধাতু দিয়ে ···তাঁর জীবন-গড়া। নামাজ-রোজা আর রিসার্চ।' এবং ডাক্তারকে কাজের নেশা থেকে বিচ্ছিন্ন করা তারও সাধ্যাতীত। লেখকের দৃষ্টিতে ডাক্তারের জীবনের নামান্তর 'শহর্-ইয়ার আর তার রিসার্চ।' কিন্তু উপন্যাসে চরিত্রটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তার চরিত্রের প্রকাশ প্রধানতঃ নায়িকার জবানীতে তার স্বমুখে শুধু শুনেছি, মাত্র ছ' বছর বয়সে সকলকে হারিয়ে প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ীতে নায়েবের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁরই বিধবা পুত্রবধূর স্নেহ-বাৎসল্যে তার জীবন গড়ে উঠেছে। মাতৃসমা বৃদ্ধার অন্তিম কামনার প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে তারই নির্বাচিতা পাত্রী শহর্-ইয়ারকে বধূ হিসেবে বরণ করেছে। ডাক্তার কর্মকীট হলেও একেবারে শুষ্ককাষ্ঠবৎ নয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একবার তার রসিকতা ও বাক্‌চাতুর্যের বিচ্ছুরণ ঘটেছে। স্ত্রী-প্রসঙ্গে তার সলাজ উক্তি:

> একেই তো বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিলেন একখানা উয়েল লুব্রিকেটেড রসনা---ডাক্তার হিসেবে নিতান্ত হিউমেন এনাটমি জানি বলে একখানা রসনাই বললুম, ইতর জন

বলবে শতাধিক----তদুপরি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশ্-কিস্মৎ নেক্-নসীব হওয়ার পর থেকে তার উপর ভর করেছে একটা আস্ত সাহিত্যিক জলজ্যান্তো মামদো! আপনার সাহিত্যিক গুণটা পেলেও না হয় সেটা সয়ে নিতুম। তা নয়। রামকে না পেয়ে পেয়েছে তার খড়ম। এখন আমার ব্রহ্মতালুর উপর শুকনো সুপুরি রেখে অষ্টপ্রহর দমাদম পিটুনি----সেই আপনি রামচন্দ্রজী, আপনার খড়ম যে বরায়ে মেহেরবানী এনাম দিয়েছিলেন তাই দিয়ে।'[৪৭]

অতি শৈশব থেকেই ডাক্তার নির্জন পুরীতে একাকী বেড়ে উঠেছে। তদুপরি আপন প্রকৃতি তাকে নিমগ্ন রেখেছে কর্মক্ষেত্রে। ফলে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা, অপূর্ণতার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। পণ্ডিত লেওনে কাএতানির দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক সেদিকে অঙ্গুলি সংকেতও করেছিলেন। তারপর পীরের শরণাশ্রিতা শহ্‌র্-ইয়ার সমস্ত দৈন্য, রিক্ততা নিয়ে নোতুন করে তার জীবনে যেন নবজন্ম গ্রহণ করলো এবং অগ্নিদেবের আশীর্বাদে ট্র্যাডিশনের বহ্নুৎসবের মধ্য দিয়ে নবজীবনের আহ্বানে তারা বহির্মুখী। কাহিনীর পরিণতিতে ডাক্তারের ভূমিকা প্রায় নাস্তি।

সত্যান্বেষী, সদাচারী পীর আমীনুর রশীদ মজুমদার সুচিত্রিত। মিরাক্‌ল্ বা ভেল্কিবাজিতে তিনিও অস্থাহীন। অন্তহীন সমস্যা নিয়ে মানুষ আসে। পরম নির্ভরে তাকায় তাঁর পানে। আর প্রত্যাশ্যাতে কতোই না বৈচিত্র্য! সিদ্ধপুরুষ কবীর--ভক্তদের প্রসঙ্গে পীর সাহেব রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন:

কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্রপড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।

এতো সাধারণ অসহায় এবং জিজ্ঞাসু মানুষের আকুলি-বিকুলি কিংবা সংশয় আপনোদনের কামনা! আর পীরের দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী মানুষের 'সম্ভব অসম্ভব সব অভিলাষই' শুনতে হয় তাঁকে। সমাগত লোকজনের প্রার্থনায় শ্রেণীবিশেষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট কৌতুককর:

> বিশ্বাস করবেন কি, সৈয়দ সাহেব, জাল দলীলপত্র তৈরী করে, ভেজাল মোকদ্দমা রুজু করে আমার কাছে স্বেচ্ছায় অকপটে সেই কপটতা কবুল করে অনুরোধ জানায় আমি যদি তার জন্য সামান্য একটু দোওয়া করি তবে সে মোকদ্দমাটা জিতে যায়![৪৮]

সৈয়দ মুজতবা আলী 'শহ্‌র্‌-ইয়ার' উপন্যাসে নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। লেখক এবং নায়িকা---উভয়ের অনুভূতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আলী সাহেবই উপস্থিত। দু'জনের চিন্তাচেতনায় সংমিশ্রণে পরিপূর্ণ মুজতবারই অখণ্ড প্রতিফলন। মুজতবা-চৈতন্যে মাতৃভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি এবং দেশজ সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রভাব উপন্যাসটিতে চমৎকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত অপার শান্তি-পারাবার হলেও তাঁর "অনুভূতির জগৎ নির্মিত হয়েছে অন্য বস্তু দিয়ে।... বৈষ্ণব পদাবলী থেকে।" চণ্ডী দাসাদির সঙ্গে পরিচয়ের পর রাতের পর রাত 'পদাবলী রস আকণ্ঠ' পান করেছেন। অতীতের স্মরণে তাঁর "গভীরতম শোক, দুর্নিবার হাহাকার---যার কোনো সান্ত্বনা নেই যে সমস্ত রাত ধরে কীর্তন গান গাওয়ার প্রথা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।... এটেই ছিল বাঙলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঐতিহ্যগত সম্পদ...।" [শহ্‌র্‌-ইয়ার, পৃ. ১১১]।

বাঙ্‌লার প্রকৃতি এবং তার অমূল্য অবদানে লেখকমানস সমৃদ্ধ। অতি শৈশবে শ্রুত ভাটিয়ালির সুরে তিনি আজীবন মোহাচ্ছন্ন। স্বপ্নের মতো দূর অতীত থেকে তার ভাসমান রেশ "--- দেখা হইল না রে শ্যাম,/ আমার এই নতুনি বয়সের কালে---" এখনো তাঁকে শৈশবের কোঠায় আকর্ষণ করে। এ-থেকে মুক্তি ছিলো না আলী সাহেবের।---'আমি পানির দেশের লোক, চতুর্দিকে জল আর জল! ...ভোরে, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরেও ভাটিয়ালি গীত। নিশ্চয়ই প্রথম শুনেছি মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। সামান্যতম বোধশক্তি হওয়ার পর থেকেই শুনেছি কান পেতে এবং অতি শীঘ্রই সেটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যে রকম আমার দেশের দানাপানি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।'[৪৯]

উপন্যাসটিকে আলী সাহেবের ব্যক্তিজীবনের দর্পণ হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। তিনি ডায়েরি রচনা করেননি, কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু

তথ্য এতে লিপিবদ্ধ। তাঁর নিরলস অধ্যয়ন এবং গভীরতম জ্ঞানের সংবাদ আমরা জেনেছি। এ'পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন 'জাগ্রত অবস্থায় কিছু একটা না পড়ে' তিনি থাকতে পারেন না। বস্তুতঃ পড়াটাই হচ্ছে তাঁর 'নেশা'। এই নেশার সুফল থেকে তিনি আমাদেরও বঞ্চিত করেননি। অধীত বিষয়লব্ধ প্রজ্ঞা দান করেছেন অকৃপণ উদারতায়। হাল্‌কা হাওয়ার দোলায় নিয়ে গেছেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। বঙ্গ-নারীর সামাজিক মর্যাদা থেকে পদাবলীর রসাস্বাদন ও সূফীতত্ত্বের গভীরতায় অবগাহন করে নারী-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কাএতানি—প্রসঙ্গের অবতরনা করেন। উপন্যাস-কাহিনীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত হলেও বিশ্ববিশ্রুত ইতালিয়ান পণ্ডিত লেওনে কাএতানি উপাখ্যানের সার্থক ব্যবহার মুজতবা আলীর অসাধারণ গল্পবয়ন দক্ষতারই পরিচায়ক। এবং প্রথম সুযোগেই তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞান অন্যের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চারিত করেছেন। ভূতনাথ খানের মুখে শহর্-ইয়ারের নাম শুনে লেখক 'স্তম্ভিত'। এই অবকাশে তাঁর মনে পড়ে,—"একদা নগরের একাংশ সহস্র স্তম্ভের ('খাম্বা'র) উপর নির্মিত হয়েছিল বলে অদ্যকার ক্যাম্বে বন্দরকে গুজরাতিতে 'খাম্বাৎ' বলা হয়, প্রাচীন যুগে 'স্তম্ভপুরী' বলা হতো। দিল্লীবাসীর কাছে এ-শব্দতত্ত্ব ফজুল। সেথাকার চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর খাড়া বলে আকবর বাদশার দুধবাপ আজীজ কোকলতাসের কবরকে 'চৌসট্ খাম্বা'বলা হয়।" [শহর্-ইয়ার, পৃ. ২০৬]।

কখনো বা স্মৃতিসমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তামালা তুলে আনেন। স্মৃতিচারণাও সুখকর। কিন্তু পাঠক কি তা' বরদাস্ত করতে প্রস্তুত? তাই কৈফিয়তের সুরেই তাঁকে বলতে হয়:

> কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। কিন্তু এসব প্রাচীন দিনের কাহিনী বলার লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন। অনেকে আবার শুনতে চায় যে।৫০

আচমকা একটা প্রশ্ন জাগে মনে, লেখকের সঙ্গে শহর্-ইয়ারের সম্পর্ক কি? উত্তরে মুজতবা লিখেছেন, 'আমার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া।' [শহর্-ইয়ার, পৃ. ১৪৭]। ব্যস্! বাকীটুকু সন্ধানের দায়-দায়িত্ব একান্তভাবে পাঠকেরই। আমরা শুধু লক্ষ্য করেছি আলী সাহেব কী সযত্নে, কতোটা সংযম ও সতর্কতা অবলম্বনে

মনস্তত্ত্ব ও কল্পনার পয়াগ মিশ্রণে তাঁর একমাত্র বাঙালী মুসলমান নায়িকাকে কল্পলোক থেকে বস্তুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটি দৃষ্টিপীড়ক অসঙ্গতি উল্লেখ্য। শহর্-ইয়ার বুদ্ধিমতী, তার জ্ঞান বহু-গামী।——যে জানে আরবী ভাষা হিব্রুর মত সেমেটিক; উর্দু বাঙলারই মত আর্য-গোষ্ঠির ভাষা।' 'বকসওলা সাহেব' সম্বন্ধেও অজ্ঞ নয়——পশ্চিম জার্মানীর পত্রিকার জন্যে যে লেখা তৈরী করে—— 'টাকাকড়ি বাবদে' যত বড় 'অনভিজ্ঞ'-ই হোক না কেন 'চোরকে উল্টো পিঠে সই'-এর মর্মোদ্ঘাটনে এ' হেন চৌকশ মহিলার অপারগতা বিস্ময়কর বৈকি! অসঙ্গতির প্রশ্নে এসে যায় আরেকটি প্রসঙ্গ। পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষাংশে বর্ণিত বীরের 'জমাকৃত ঘৃত প্রসঙ্গ' অহেতুক অকারণে পুনরাবৃত্ত ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথমাংশে।

মুজতবা আলীর রচনার বিশেষ আকর্ষণ 'রসিকতায়' 'শহর্-ইয়ার'ও দীন নয়। যেমন----

ক. প্রসঙ্গ : চোর

"এ চোরটা একেবারেই রামছাগল। দু'দুটো আলসেশিয়ান আমার বাড়িতে। এ দেশটাই মোস্ট ইন্‌কমপিটেন্ট, চোরগুলো পর্যন্ত নিষ্কর্মা--- দিনের বেলা একটু খবরাখবর নিলেই তো বুঝতে পারতো ভদ্র চোরের পক্ষেই এ বাড়ি ভাদ্রবধূ।" [পৃ. ৩১]।

খ. প্রসঙ্গ : যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

"যুধিষ্ঠির ফরিয়াদ করে বলছেন, 'এ কুত্তাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। একে এখানে ছেড়ে গেলে আমার পক্ষে বড় নিষ্ঠুর আচরণ হবে।"

সরল ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, এতো মহা ফ্যাসাদ। এই যুধি-ষ্ঠিরটা তো আপন স্বার্থ কখনো বোঝেনি, এখনও কি আপন কল্যাণ বোঝে না? ...বললেন, 'ধর্মরাজ, ...এসব বিদঘুটে বয়নাক্কা করো না। আমার এই অতি পূত, হেভেনলি বেহেশতের রথে ঐ নেড়ি, ঘেয়ো অতিশয় অপবিত্র কুকুর---আর হাইড্রফবিয়া থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়----কি করে ঢুকতে পারে?" [পৃ. ২৩৫]।

গ. প্রসঙ্গ : মুজতবা আলীর ঘুমকাতুরে অলস কুকুর।

'সে [কুকুর] তার আচার-আচরণে অনুকরণ করে আমাকে। আমি নীরব থাকলে সেও নিশ্চুপ। আমিও তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি—সর্বোপরি তার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। কিন্তু এ-শীলে সে আমাকে রোজই হার মানায়।" [পৃ. ২১৬]।

ঘ. প্রসঙ্গ : পুরুষের মূর্খতা।

'আজো যদি ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ থেকে সব কটা পুরুষকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে নারী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে তারা ন'মাস দশদিনের ভিতর মার্কিন-রুশ-মৈত্রী প্রসব করবে।' [পৃ. ২৪৬-৪৭]।

০৫. মুজতবা আলীর সর্বশেষ উপন্যাস 'তুলনাহীনা'—লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। গ্রন্থটির সর্বাঙ্গে পরিমার্জনার অভাব পরিস্ফুট। নায়িকা শিপ্রা রায় অতুলনীয়া—যদিও শব্‌নম্‌ কিংবা শহর্‌-ইয়ারের বিদগ্ধতা তার নেই। অবশ্য তাদের তুলনামূলক আলোচনায় পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহ্যিক পটভূমির কথাও স্মরণে রাখতে হবে। বিশেষ করে শহ্‌র্‌-ইয়ার ও শিপ্রা উভয়েই শিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা এবং মুক্তমনা হলেও তাদের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মুজতবার শেষোক্ত নায়িকাত্রয়ের জীবনে পিতৃপ্রভাব ব্যাপক। শব্‌নম্‌ ও শহ্‌র্‌-ইয়ার বাল্যে মাতৃহীনা, জনকের স্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিতে বর্ধিতা। শিপ্রার মাতা অনুল্লিখিতা—পিতা তার দীক্ষাগুরুও বটে। প্রাচীন মূল্যবোধের বর্মে শহ্‌র্‌-ইয়ার সুরক্ষিতা। শিপ্রাকে পিতা গড়ে তুলেছিলেন বিশেষ সোসাইটির—যে সোসাইটি আমাদের দেশে সুস্থ দৃষ্টিতে সমালোচিত—কালোপযোগী করে। প্রথম গ্রন্থটির মতো সর্বশেষ পুস্তকের নামচয়নেও আলী সাহেব গুরুমুখাপেক্ষী। যার সন্ধানে গুরুদেব গিয়েছিলেন "সাতসমুদ্র পেরিয়ে" এবং অতঃপর—

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

ভাগ্যবান মুজতবা তারই সন্ধান পেয়েছেন দোরের কাছে বাঙলাদেশে। এবং এ'গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রগামী।

নায়িকা শিপ্রা যথার্থ অর্থেই 'তুলনাহীনা'। ভালোবাসার পাত্রকে আচমকা মনের কথা নিবেদনে কোন রকম জড়তা বা কুণ্ঠা নেই তার। প্রতি পদেই নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন, "শিপ্রা...সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে।" বহুদিন প্যারিসে প্রবাসজীবন অতিবাহিত এবং সর্বশিক্ষার গুরু স্বয়ং পিতৃদেব। আত্মনির্ভরতার নিরঙ্কুশ প্রত্যয় তাঁরই নিকট থেকে লাভ করেছে। 'সোসাইটি গার্ল' হলেও নিঃসঙ্গতায় মাঝে-মধ্যে সেও বিষণ্ণ। আপন শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-সংস্কৃতি মেনেই সে নিজেকে তৈরি করেছে। আর পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ ফরাসী জেনারেলের উপলব্ধ সত্য তাঁরও জীবন-বেদ—'সবচেয়ে মূল্যবান ধন মানুষের মনুষ্যত্ব। ...সেটাতে মানুষ পৌঁছয় দেশাত্মবোধ, ন্যাশনালিজম, পেট্রিয়টিজমের ভিতর দিয়ে এবং তার দৃঢ়ভূমি—...স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা চিরদিনের।' শিপ্রার ভালোবাসার ধন কীর্তিনাশ চৌধুরী এবং তার ভালোবাসা শব্‌নমেরই মতো—নিঃশর্ত, সমুদ্রের মতো অতলান্ত। সরলচিত্ত নায়ক রবীন্দ্রকাব্যের নিষ্ঠাবান পাঠক এবং তার "রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালেকশন...যা আছে সেটা রীতিমত বিরল।"

১৯৭১-এর বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে 'তুলনা-হানা'র জন্ম। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা সহোদর পশ্চিম বঙ্গের জনচিত্তেও তুলেছিলো প্রচণ্ড আলোড়ন। কীর্তি-খান-জিমি-বেয়াত্রিচের পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থনের বিপরীতে মির্জা এবং তার বন্ধু পাকিস্তানী চর লারীর ভূমিকা সক্রিয়। অপর বাঙ্‌লায় ধূমায়মান অবস্থায় খান, কীর্তি ও শিপ্রার আগরতলা যাত্রা। এবং ইতিমধ্যে পাকিস্তানী সেনার অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্ত অতিক্র-মণের পালাও শুরু হয়েছে। এদেরই একজন হাজী সাহেবের নিকট থেকে মোটামুটি একটা ধারণা নে'য়ার চেষ্টা করে শিপ্রা।

হাজী সাহেবের সঙ্গে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলো কীর্তি। যে-পৈশাচিক তাণ্ডবের আশঙ্কা করছিলো, পূর্ব বঙ্‌লার বুকে তার কাঁপন নয়—জোর ধাক্কা লেগেছে ইতিমধ্যেই। রাজশাহী থেকে আগত মুক্তিসেনার কাছে শুনেছে পাক-বাহিনীর বহু বর্বরোচিত রোমহর্ষক কাহিনী। যে-কোন মুহূর্তে পুঞ্জীভূত ধূম্র

থেকে প্রজ্বলিত বহ্নির লেলিহান শিখা পূর্ব বাঙলা অতিক্রম করে আগরতলাকেও গ্রাস করতে পারে। তাই কীর্তির অনুরোধে শিপ্রা শিলঙে এসে তার জন্যে অপেক্ষা করে। স্বল্পবাক নির্বিরোধী কীর্তির মধ্যে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন। আজ যদি অকারণে পূর্ব বাঙলার বুকে ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হয়, তাহলে যমজ পশ্চিম বঙ্গ কি শুধু নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় নিষ্ক্রিয় থেকে ভ্রাতৃহনন প্রত্যক্ষ করবে? শিলচর-করিমগঞ্জ সফর করে অশান্ত কীর্তি ও খান ফিরে এলো শিলঙে। ওদিকে পূর্ব বাঙলায় বাঙালী নিধন চলছে পুরোমাত্রায়। সশস্ত্র-নিরস্ত্র সম্মিলিত বাঙালী রুখে দাঁড়িয়েছে মানবতার শত্রুর বিপক্ষে—স্বাধনীতার লক্ষ্যে। ভীরু অবশতার নির্মোক-মুক্ত কীর্তিও প্রস্তুত। কালের আহ্বান উপেক্ষা করে কোন জন? সিলেট থেকে বাল্যসখী বিলকিসের পত্রে বাঙ্লাদেশের মারণযজ্ঞের চিত্র পেয়ে শিপ্রা চঞ্চলা। কীর্তিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সীমিত সামর্থ্য নিয়েই দাঁড়াতে হবে ওপারের নিপীড়িত ভাইদের পাশে। পীড়িতের আর্তনাদকাতর ব্যাকুলতায় বিমূঢ় কীর্তিকে শিপ্রার প্রেমই যেন সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে, 'অপদার্থকে' দিয়েছে জীবনের দিশা। কীর্তির নিরীহকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ, ধ্বনিত অভয় বাণী—'ভাই আমরা আছি'। দুঃসময়ের মুখোমুখি শক্তিরূপিণী শিপ্রা স্বয়ং তার প্রেরণাদাতৃ—"তুমি যাবে পুব দিকে, ছায়ার মত তোমার পিছনে 'আমি আছি'।।"

স্বাধীন বাঙ্লাদেশের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয় এবং নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রণয়ের 'সুখদ পরিণামের ইঙ্গিতের' মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। মানব জীবনের অপূর্ণতা-বেদনার প্রসঙ্গ এলেও উপন্যাসটি কোনক্রমেই অন্তহীন নৈরাশ্যের আলেখ্য নয়। প্রত্যাশা মানুষকে জীইয়ে রাখে এবং তারই প্রতিবিম্ব মুজতবা আলীর উপন্যাস—একমাত্র ব্যতিক্রম 'অবিশ্বাস্য'।

সম্ভাব্য যুদ্ধের পেক্ষাপটে অশনি-সংকেতের মুখে কাহিনী গতি পেয়েছে, বিকশিত নায়ক-নায়িকার হৃদ্‌কমল। পূর্বরাগের সবিস্তর ব্যাখ্যান মুজতবা আলীর কোন উপন্যাসেই নেই। পরিপূর্ণ প্রণয়ের মধ্যে এক ঝট্‌কায় নায়ক-নায়িকাদের পাঠকের দরবারে উপস্থিত করেন এবং দ্বন্দ্ব-দহন, প্রত্যয়-প্রত্যাশা ও রোমন্টিকতার স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের মূর্তিমান করে তোলেন। আলোচ্য পুস্তকটিও ব্যতিক্রম

নয়। "তুলনাহীনা" প্রেমের উপন্যাস। রবীন্দ্র-নিষ্কাত লেখকের কলমে সৃষ্ট উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেবল রঙ্গস্থলের আকস্মিক সাদৃশ্য দেখে একথা লিখছিনে, প্রেমালাপনেও বন্যা-মিতার (লাবণ্য-অমিত রায়) কথা মনে পড়ে যায়।...শিপ্রা কীর্তিকে সেই অধরা প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছে যে বাঁধনে অমিত রায় বাঁধতে চেয়েছিলো লাবণ্যকে। তফাৎ এইখানে, লাবণ্য অমিতের প্রেমে শেষ ভরসা রাখেনি, কীর্তি শিপ্রার প্রেমে তা রাখতে চেয়েছে।"[৫১]

একটি উপন্যাস অপর উপন্যাসের প্রতিভাস আনতে পারে এবং 'শেষের কবিতা'র রোমান্টিকতা 'তুলনাহীনা'-তেও অনুভূত। কিন্তু উভয় গ্রন্থের কুশীলবরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের। চিন্তাচেতনায় তাদের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। বিশেষ করে লাবণ্য-অমিতের বৈদগ্ধ্য ও সম্ভ্রমবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত শিপ্রা-কীর্তির মধ্যে। লাবণ্য-অমিত অনেকটা অন্তর্মুখী, অত্যধিক আত্মসচেতন এবং কল্পনা ও সুকুমার-বৃত্তির চর্চায় তাদের স্ফূর্তি ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। পক্ষান্তরে শিপ্রা-কীর্তির প্রবণতা বহির্মুখী এবং ব্যক্তিত্বের অবশিষ্টাংশ শিপ্রার মধ্যে দৃষ্ট হলেও নায়িকার করুণাপ্রাপ্ত কীর্তি একেবারেই বিবর্ণ। একটি সাময়িক উত্তেজনায় তার সুপ্তচেতনা ক্ষণতরে উদ্ভাসিত মাত্র। রবীন্দ্রমানসের সুচিস্নাত সংস্কৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপে অমিত-লাবণ্য মাধুর্য-মণ্ডিত, বোহেমিয়ান মুজতবার শিপ্রা-কীর্তি বিশেষ সমাজের 'সুরা ও সাকী কালচারের' প্রতিভূ। ভাষার সাদৃশ্য কিংবা নৈকট্য রোমান্টিকতার ফলমাত্র। সুতরাং 'শেষের কবিতা' ও 'তুলনাহীনা'র তুলনা নিষ্প্রয়োজন, নিষ্ফল।

বঙ্গবিভক্তির বিষক্রিয়া এবং অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় বাঙালী এখনো মোহ্যমান। এই অভিশাপের মর্মজ্বালা আজীবন ভোগ করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। কৃত্রিম বিভাজনই একদিন সূর্যের বাস্তবতা নিয়ে দেখা দিলো। ফলে বহু পরিবার, আত্মজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো পরস্পরের নিকট থেকে। অবশতার প্রাথমিক ঘোর কেটে গেলে অনুভূত হলো বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুঃসহ যন্ত্রণা—অনেকটা বিলম্বে। ততক্ষণে খাড়া হয়ে গেছে বিচ্ছেদের প্রাচীর। কিন্তু অনুভূতির মুক্তাকাশে তা' কখনো অচলায়তন সৃষ্টি করতে পারেনি। সুখে-দুঃখে মনুষ্যত্বের সেতুবন্ধনে

তারা অচ্ছেদ্য। ১৯৭১-এ পূর্ব বাঙলার দুঃসময়ে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় সমর্থন-সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চল থেকে। তারই অনুভূতি 'তুলনাহীনা'। এবং নায়কের কণ্ঠে যেন শাশ্বত বাঙালীর—চিরন্তন বাঙলার কণ্ঠ বাঙ্ময়:

> পূর্ব বাঙলার পাশে গিয়ে পশ্চিম বাঙলার দাঁড়ানোটা আমার কাছে এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নিজের জন্য আমি কোনো যুক্তি, ঐতিহাসিক নজীর বা আন্তর্জাতিক আইনকানুনের সমর্থন খুঁজিনি।' [তুলনাহীনা, (১ম প্রকাশ), পৃ. ২২৬]।

প্রচণ্ড ভূকম্পে কৃত্রিম বিভেদের পাঁচিলটা সত্যের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্ষণিকের জন্যে:----"শক্তিশালী হামেশাই দুর্বলকে পরাজিত করে।

কিন্তু তার পর যদি বাঙাল্‌রা পাঞ্জাবীর দাসত্ব স্বীকার করে নেয় তবে সেখানে বাঙালের লজ্জা। তুই আমি বাঙালী—আমাদেরও লজ্জা।" [তুলনাহীনা, (১ম প্রকাশ), পৃ. ৬৯]।

সুদিন চৌধুরীর দৃষ্টিতে শিপ্রা রায় 'আস্ত একটা ভলকানো' এবং সৃষ্টিমুহূর্তে বিধাতা তার মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে 'তেজ' ঢেলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। দেশের সঙ্গে 'কুণ্ঠাহীন হৃদ্যতা' এবং বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা'র সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'তার জীবনদর্শন'। প্যারিসের অতি মুক্ত পরিবেশে কেটেছে কিছুদিন। পিতা দিয়েছিলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। 'পবিত্র শাস্ত্রীয়, আচারসম্মত এ ধরনের শব্দ তার অভিধানে ছিল না, কারণ তার পিতাই স্বহস্তে সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন।'[৫২] পিতা তার দীক্ষাগুরুও বটে। বিদ্যাচর্চা থেকে 'পার্টি দেয়া', পানীয় পরিবেশন পর্যন্ত তাবৎ জ্ঞানে তাঁরই হাতে খড়ি। তার বাড়ী নটবরদের আখড়া। সে-ও মোহাবিষ্টা হয়, তার চোখেও আবেশ লাগে। কিন্তু তার সংযম, প্রখর বিচারবোধ ও চারিত্র্য শুধু তাকেই সংযত রাখে না, অন্যদেরও সীমা-স্বীকারে বাধ্য করে। ফলে তার পার্টিতে 'বান্‌চালের' ঘটনা ঘটে কদাচিৎ। জনাকীর্ণ পরিবেশেও একাকীত্ব কখনো কখনো দুঃসহ হয়ে ওঠে। এ' নারীর অপূর্ণতার তথ্য আমরা অবহিত নই। কৃপাপ্রার্থীদের মধ্যে কীর্তিনাশ চৌধুরীকে বন্ধু হিসেবে, জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় এবং এ'জন্যে কোন

চড়াই-উৎরাই-ও তাদের অতিক্রম করতে হয়নি। 'সজীব' কীর্তির 'অফুরন্ত প্রাণরস'-ই তাকে আকর্ষণ করেছিলো। এবং তার 'কৃপার' কথা প্রকাশ করতে একমুহূর্ত সময়ও লাগেনি। কৃতজ্ঞ কীর্তির কাছে নিজের অসহায়তা মেলে ধরতেও তার আর দ্বিধা নেই,----'তুমি সহজে বুঝবে না, জনতার মাঝখানে একটা মানুষ কতখানি নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত হতে পারে।' এ' নারীর মানসগঠনে দেশী-বিদেশী অনুভূতির অপূর্ব মিশ্রণ---একদিকে বন্ধনহীনতায় দিশেহারা, অপরদিকে বিধি-লিপিতে প্রশ্নহীন প্রত্যয়।---"আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি দৈবে, অদৃষ্টে----আমি ফেটালিস্ট, অনেকটা খৈয়ামের মত। তাঁর প্রত্যাদেশ, তারই ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলে পেয়ালা অধরে ধরো। অর্থাৎ আনন্দ করো। সেটা তো মোটামুটি মানিই, কিন্তু সবচেয়ে সেই ফরাসী বৃদ্ধ জেনারেল আমাকে যে ধর্মে দীক্ষা দেন :

লিবের্‌তে লিবের্‌তে, তুজুর লা লিবের্‌তে।"৫৩

এটাই শিপ্রার জীবনভাষ্য, তার দর্শন। এর মধ্যেই নিহিত তার চরিত্রের রহস্যময়তা, নিঃশর্ত ভালোবাসার চাবিকাঠি। তার সংবেদন-শীল হৃদয় সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করেছে কীর্তির ভালোবাসা। তাই নিজেকে সমর্পণে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি এবং পরিপূর্ণতম বিশ্বাসে সে উচ্চারণ করতে পারে, 'আমার প্রেম তুমি দিনে দিনে চিনে নিও, আমি আশা ধরি, তুমি কোনো দিন তার শেষ অতলে পেঁছিতে পারবে না।'----যেন শবনমেরই কণ্ঠস্বরের অনুরণন। স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়েছে শিপ্রা, শুধু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চেয়েছে কীর্তির কাছে। তার বেশী নয়।

বাঙ্‌লাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের চিন্তা-চেতনা তথা জীবনের মোড় চিহ্নিত করে দেয়। দেশ বিভক্ত----নাড়ির যোগ অচ্ছিন্ন। ইছামতির ওপারের বুক ফাটা কান্নায় এপারও উদ্বেলিত। শিপ্রার দৃঢ়তা সঞ্চারিত কীর্তির মধ্যেও, তার অনুপ্রেরণায় আপন সীমাবদ্ধতাকে নির্বিঘ্নে অতি-ক্রম করার দুঃসাহস জাগে বুকে। উদ্দীপ্ত কীর্তি শিপ্রার মুখে শোনে প্রবীণ ফরাসী জেনারেলের আপ্তবাণী----

> "যে ভেঙে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তাকে প্রবলতম শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না। যে জাত ভেঙে পড়েনি, সেও যেন

অপরের সাহয্যের উপর বড্ড বেশী ভরসা না রাখে।"
[তুলনাহীনা, পৃ. ২৫২]।

এবং শিপ্রার দৃঢ়তম বিশ্বাস 'পূর্ব বাঙলা যদি স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয় তবে স্বাধীনতা আনবে সে-দেশের চাষাভূষা, মাল্লামাঝি এমন কি লেঠেল--ডাকাতও কিছুদিনের তরে পৈত্রিক ব্যবসা ক্ষান্ত দিয়ে----তারা গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র কিছুই বোঝে না। বোঝবার দরকারও নেই।' [তুলনাহীনা, পৃ. ২৫৭]।

ভাই-এর পাশে দাঁড়ানোর এই তো সুসময়। ভয় কি! 'বার'-এর 'মক্ষিকা-রাণী'র মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে প্রেরণাদাতৃতে উত্তরণের স্তরটি সুকৌশলে নির্মিত। বাইরের ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ 'তুলনাহীনা'র নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিকাশের উপাদান হিসেবে আলী সাহেব ব্যবহার করেছেন। নৈপুণ্য আছে---পারিপাট্যের অভাব।

নায়ক চরিত্র সৃষ্টিতে আলী সাহেবকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নায়িকাদের কৃপা-করুণায় নায়কজীবন সমৃদ্ধ। আচমকা নায়িকাদের দর্শন কিংবা অনুগ্রহলাভ করে এই ভাগ্যবানদের জীবন ধন্য। এদের অন্যতম কীর্তিনাশ চৌধুরী। এই নিরীহ নির্বিরোধী লাজনম্র মানুষটি অবিশ্বাস্যরূপে শিপ্রার অযাচিত প্রেম লাভ করে কৃতজ্ঞ এবং এ'হেন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও বটে! তার আবেগ পাগলপারা। ---"কোনো নোটিশ না দিয়ে কীর্তি হঠাৎ মাথা নিচু করে শিপ্রার একটা পায়ে চট্ করে চুমো খেয়ে অন্য পায়ে চেপে দিতে লাগলো দীর্ঘতর চুম্বন।" [তুলনাহীনা, পৃ. ৭৩]। অথবা, শিপ্রার বারিসিক্ত পাদপদ্ম লক্ষ্য করে আতঙ্কিত নায়কের উৎকণ্ঠা ও দৃষ্টিকটু কর্তব্যবোধ:

> "এখখুনি পা মুছে ফেলো----না আমি ভালো করে আচ্ছাসে রগড়ে রগড়ে বোন্-ড্রাই করে দেব?"...
>
> শিপ্রা ডিভানে বসে পা-দুটি প্রসারিত করলো। বললে, "বাথ-রুমে বড় টাওয়েল আছে।"
>
> সঙ্গে সঙ্গে দেখতে না দেখতে কীর্তি গেল আর এল।
> [তুলনাহীনা, পৃ. ৯৩]।

এতো ভালো মানুষ কিংবা 'ছেলেমানুষ' নায়ক অতি শীতল পাঠকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। এ' প্রেম নয়, বিকার। এবং আমাদের সৌভাগ্য, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় 'বিকার' ক্রমেই দার্ঢ্যে পরিণত। শিপ্রার প্রভা এবং নায়কের সুপ্ত পৌরুষ সংগ্রামের আহ্বানে মশাল হয়ে ওঠে। কীর্তি তখন এক নোতুন মানুষ। তার সংশয় নেই, 'প্রবলতর শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়াতে, তার দাসত্বে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়াতে সর্বনাশের চেয়ে সর্বনাশ। কারণ তার ফল ভোগ করতে হবে তাদের সন্তানদের বংশানুক্রমে।' [তুলনাহীনা, পৃ. ২৫২]।

জাতিবোধে উজ্জীবিত সংগ্রামী অনুভূতিতে কীর্তিনাশ পরিণত, পরিপূর্ণ মানুষ এবং বাঙালী হিসেবেই পূর্ব বাঙ্‌লার সর্বনাশরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানাসিক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই আলী সাহেব তাঁর কম্পিত হস্তে কোনক্রমে নায়কের ভরাডুবি রোধের চেষ্টা করেছেন।

এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, 'বারমেড' সিন্নোরীনা বেয়াত্রিচে ও হোটেলের 'রিসেপশনিস্ট' জিমি উইলসন এবং বাঙ্‌লাদেশী উদ্বাস্তু হাজী সাহেব চরিত্রানুগ পরিণতিতে সুসমঞ্জস। 'বসন্তসেনা শ্রেণীয়া মনোরঞ্জিণী, চিত্তহারিণী' পরিবারের কন্যা বেয়াত্রিচে মাদসীনির রচনার দ্বারা প্রভাবিত, উদ্দীপ্ত। তাবৎ স্বাধীনতাকামীদের প্রতি রয়েছে তার সর্বাত্মক শুভেচ্ছা। এবং বাঙ্‌লাদেশের সংগ্রামীদের সঙ্গেও তার একাত্মতা আন্তর-প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্ত। মাটির প্রতি আসক্তি এবং দেশপ্রেমের 'হৃদয়ের যুক্তি'তে জিমি অত্যুজ্জ্বল। তাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই 'ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায়' চলে গেলেও এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে সত্ত্বেও জিমির পিতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করেননি। অভিন্ন যুক্তিতে পুত্রও দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগে অভিলাষী। জিমিকে পিতা বলেছিলেন, 'যারা যাচ্ছে যাক্। আমি কক্‌খনো বলবো না, তারা অন্যায় করেছে। কিন্তু, মাই জিমি, আমি যে দেশে জন্মেছি, যে-দেশকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসতে শিখেছি, সে-দেশ আমি ত্যাগ করতো পারবো না। আমি এ-দেশেই মরতে চাই, যাতে করে আমার বাপ পিতামোর হাড্ডির কাছে আমার হাড্ডিও ঠাঁই পায়—আই উয়ান্ট মাই বোন্‌স্ টু বি গেদার্‌ড্ আনটু মাই ফোর ফাদার্স হোয়ার দে আর।'[৫৪] জিমির ক্ষেত্রেও তাই। সে চলে গেলে পিতা-পিতৃপুরুষের

"গোরে ফুল দেবে কে?" মাতার পার্শ্বে অন্তিম শয্যা লাভের একান্ত কামনা সৈয়দ মুজতবা আলীরও ছিলো।

হাজী সাহেব বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং রসবোধ ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। তার অন্যতম ব্যবসা ছিলো ক্যান্টনমেন্ট-এ রসদ যোগানো। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই সে ছিট্‌কে পড়ে সীমান্তের এ-পারে। সেনা-ছাউনির চাহিদা মেটানোর জন্যে 'পোলট্রি ফার্ম' স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী কর্নেল হাজীর মতো বিশেষজ্ঞের অভিমত চাইলে তিনি সেই সব অমূল্য তথ্য চালান করলেন "যে সব ঢাকা কলকাতা দেয় তাদের 'রুরাল ব্রডকাস্টে' পশুপক্ষী পালন বাবদে চাষাদের। শুনেছি, ওগুলো পালন করলে প্রতি তিন মাস অন্তর মুরগীর মড়ক অনিবার্য। অবশ্য আল্লা যদি আমাদের প্রতি সদয় হন।" [তুলনাহীনা, পৃ. ১১৮]। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বাক্‌চাতুর্য হাজীর বৃত্তিরও সহায়ক। তাঁকে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে প্রায়ই এদেশ-ওদেশ করতে হয়। সুতরাং, রাখতে হয়েছে 'তিনখানা পাসপোর্ট' এবং হরহামেশাই বর্ডার-দেবতাদের সওগাত দিতে হয় 'বোতলটা বাতলটা, বউয়ের জন্য জবাকুসুমটা ছেলের জন্য ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বক্স'টা প্রভৃতি। হাজী সাহেব সহৃদয়, সজ্জন। তাঁর উপলব্ধিতে উদার মনুষ্যত্বের বাণী অনুভূত।—'প্রতি দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান যখন একে অন্যকে বাঁচায়— তখনই দেখি,...মানুষের মনুষ্যত্ব। স্বার্থপর পলিটিশিয়ানদের প্রপাগান্ডা উপেক্ষা করে, পথভ্রষ্ট ধর্মযাজকদের অনুশাসনে কান না দিয়ে, সশস্ত্র গুণ্ডাদের ভীতি প্রদর্শনকে তুড়ি মেরে কে মানুষকে তখন সত্যের পথে, আর্তজনকে রক্ষার পথে চালায় কে?—সে তার মনুষ্যত্ব।' [তুলনাহীনা, পৃ. ১৪৯]। পূর্ব বাঙ্‌লার বিহারীদের ঘৃণ্য আচরণে বিক্ষুব্ধ হাজী তাদের জন্যেও বেদনা বোধ করেন। এরা পাঞ্জাবীদের চেয়েও নৃশংস পদ্ধতিতে বাঙালীর বিরুদ্ধতা করবে। আপন হাতে খনিত মৃত্যুকূপই হবে তাদের অন্তিম আশ্রয়। 'পাঞ্জাবীরা অবস্থা মারাত্মক জানামাত্রই ফিরে যাবে আপন দেশে, ওরা যাবে কোথায়? দে হ্যাভ্‌ বার্নট দ্যার বুলক কার্ট্‌স।'[৫৫]

এ' গ্রন্থেও পাহাড়ী কন্যার তাস গুণে ভবিষ্যৎনির্ণয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে। আর শিপ্রা তো ভাগ্যের অমোঘতায় তার আস্থার কথা পূর্বেই প্রকাশ করেছে।

'অত্যাধুনিক' শিল্পকলা মুজতবা আলীর সম্ভ্রম আদৌ পায়নি এবং গদ্যকবিতা তাঁর ভাষায় 'গবিতা'। সুযোগ পেলেই এই 'অত্যাধুনিক-তার' ওপর সম্মার্জনী বুলোতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। শিপ্রার মুখে আলী সাহেবের বক্তব্যেরই ঘরোয়া রূপ: "সব চেয়ে খাসা মানায়, যদি আমি সেখানে কোমরে আঁচল বেঁধে, টাটা স্টিলের কড়াইয়ের খাগড়াই কাঁসার খুন্তি দিয়ে তোমার জন্য পুঁই শাকের চচ্চড়ি ঘ্যাঁটাই।" অতঃপর মুজতবার রসসংযোজন:

> আহা, যেন একটি সার্থক গবিতা! এই একটি বাক্যকেই তিন অসমান হিস্যেয় ভাগ করে তিন লাইনে ছাপলেই কোথায় পাউন্ড, কোথায় বন্ধু সমর সেন?
>
> ডাস্টবিন্-এ পচা ইঁদুর
> রিকশায় চীনা গণিকা
>
> এগুলো মহাকাব্য রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এবারে জুড়ে দিলে ময়দানের মিনার-শিখরে ইশটিলের কড়াই।" [তুলনাহীনা, পৃ.৭৬]।

আলী সাহেবের সরস রসিকতার স্পর্শে এ উপন্যাসটিও স্থানবিশেষে সুখপাঠ্য। যথা:

> ক. [লারী] 'বললেন, "বাঙালী আর্যের পূর্বপুরুষ তো পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। তাঁরা তো পাঞ্জাবী।"
>
> অতিশয় মৃদুকণ্ঠে সুদিন বললে, "এবং তাদের পূর্ব পুরুষ বাঁদর— ডারউইন বলেছে।" [তুলনাহীনা, পৃ. ৮৮]।
>
> খ. আমাদের...এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কে যেন কথাচ্ছলে বলে, 'অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয়, ১৭৭৪-এ'। মন্ত্রী সবিস্ময়ে শুধোলেন, 'তার আগে মানুষ বাঁচতো কি দিয়ে?' [তুলনাহীনা, পৃ. ২৪৬]

সৈয়দ মুজতবা আলীর বহুবিধ রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং বিষয় ও শৈলীর বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ। বীভৎস রসের অবতারণা তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। বস্তুতঃপক্ষে এই বস্তুটিকে তিনি সযত্নে পরিহার করতেন। কিন্তু বীভৎসতার বর্ণনাতেও তিনি যে কতোটা

সাবলীল, সুনিপুণ ও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট তার প্রমাণ পরলোকে হিটলার সমীপে পাঠানো বাঙ্‌লাদেশে পাকিস্তানী পাশবিকতার ফিরিস্তি:

'...হিটলার সাহেব, কী বাতাই আপকো। সব্‌সে খাবসুরৎ দেখলুম, লাল খুন তার দুধের মতো সফেদ উরুর উপর——ওয়াহ্, ওয়াহ্। সব-কুছ্ আমার পীর সাহেবের মেহেরবাণীতে। ...কিন্তু, হুজুর, জওয়ান ঔরৎটা বড়া বেতমীজ ছিল। কুছ্ না——আচানক দম বন্ধ——ঝট্‌সে মরে গেল। আমাদের শের দিল্ খান গয়রহ তিন বেরাদর তখনো বাকী। লেকিন ওরা পাক্কা মর্দ। জিন্দা মুর্দাতে ফরক করনেওয়ালা পাঠানকা বেটা ওরা নয়। জঙ্গী খান একটা চোচীর ডগা কামড়ে মুখে পুরলো। আমি ছোরা দিয়ে দুসরাটা কেটে——এ্যাসা বড়া কভীভী দেখবার খুশ-কিস্মৎ আমার জিন্দেগীতে হয়নি——পুরা সমূচা হাড্ডিতক কেটে আমার সঙ্গীনের ডগায় খোঁচা দিয়ে সঙীন উঁচা করে ধরলুম।...মেজর আসদ খান আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বড়া বড়হীয়া খেদমৎ করেছ পুরব-পাকিস্তানের, কাফির লেড়কীকে খতম করে——পাক্ মহরম মাসে। সোনার মেডেল পাবে। আমি সুপারিশী চিঠ্‌ঠি আজই ভেজ দেব।'[৫৬]

সংখ্যায় নগণ্য হলেও স্থান-কাল-পাত্র ও কাহিনীর বৈচিত্র্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস উল্লেখ্য।

**তথ্যনির্দেশ**


১ শ্রীভূদেব চৌধুরী: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (১ম প্রকাশ, ১৯৬২)। পৃ. ৩১

২ ঐ, পৃ. ৩৫

৩ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: কালের পুত্তলিকা——বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর (১ম সংস্করণ), পৃ. ১০

৪ গজেন্দ্রকুমার মিত্র: ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৵.

৫ অবিশ্বাস্য, (১ম সংস্করণ), পৃ. ১০

৬ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৭২), পৃ. ৪৪৭

৭ শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে লেখা মুজতবা আলীর পত্র।

৮ গজেন্দ্রকুমার মিত্র: ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৵.-১৷.

৯ শ্রীঅমলেন্দু সেনকে লেখা আলী সাহেবের পত্র।

১০ প্রমোদ সেন: পুস্তক সমালোচনা, অবিশ্বাস্য; উষা, আষাঢ় ১৩৬১, পৃ. ১৬৭-৬৮

১০ক প্রমোদ সেন, ঐ

১০খ ঐ

১১ অবিশ্বাস্য, (১ম সংস্করণ), পৃ. ১২০-২১

১২ ঐ, পৃ. ১৪৯

১৩ ঐ, পৃ. ১৭৬

১৪ ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯

১৫ ঐ, পৃ. ৯২

১৬ ঐ, পৃ. ৪৯

১৭ অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরীকে লেখা মুজতবা আলীর পত্র।

১৮ শব্‌নম্‌, (১ম সংস্করণ), পৃ. ৩০

১৯ শ্রীসুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৭৫

২০ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ. ৪৫১-৫৩

২১ ঐ, পৃ. ৪৭৪

২২ শব্‌নম্‌, (১ম সংস্করণ), পৃ. ৩

২৩ শ্রীসাগরময় ঘোষকে লেখা মুজতবা আলীর পত্র।

২৪ শ্রীঅমলেন্দু সেনকে লেখা মুজতবা আলীর পত্র।

২৫ শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৩, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৫

২৬ ঐ, পত্র-৬, ঐ, পৃ. ৩১২

২৭ প্রমথনাথ বিশী : পুস্তক পরিচয় (শব্‌নম্‌), বেতার জগৎ, ২২ নভেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৮৬৪ক এবং ৮৯২ক

২৮ পুস্তক পরিচয়, দেশ, ২ ভাদ্র, ১৩৬৮, পৃ. ২৭২

২৯ শব্‌নম্‌, পৃ. ৫

৩০ ঐ, পৃ. ৬৮

৩১ শহ্‌র্‌-ইয়ার, (১ম সংস্করণ), পৃ. ৪৪

৩২ শব্‌নম্‌, পৃ. ১৯৮

৩৩ ঐ, পৃ. ১৮৬

৩৪ ঐ, পৃ. ১৪১

৩৫ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ।.

৩৬ সুশীল গঙ্গোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৵.

৩৭ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : আলোচনা (শহ্‌র্‌-ইয়ার), দেশ, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৬

৩৮ শহ্‌র্‌-ইয়ার (১ম সংস্করণ), পৃ. ৮৫

৩৮ক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা, ঐ

৩৯ সত্যকাম সেনগুপ্ত : আলোচনা (শহ্‌র্‌-ইয়ার), দেশ, ৬ ভাদ্র ১৩৭৬, পৃ. ৩৮৪

৪০ মাধুরী চৌধুরী : আলোচনা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, দেশ, ১৩ ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃ. ৪৯৬

৪১ শহ্‌র্‌-ইয়ার, পৃ. ২৫১

৪২ দিলীপকুমার রায় : আলোচনা, দেশ, ৬ ভাদ্র, ১৩৭৬ পৃ. ৩৮৪-৮৫

৪৩ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ।.

৪৪ শহ্‌র্‌-ইয়ার, পৃ. ৩৩

৪৫ ঐ, পৃ. ২২৩

৪৬ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ॥.

৪৭ শহ্‌র্‌-ইয়ার, (১ম সংস্করণ), পৃ. ৫৬

৪৮ ঐ, পৃ. ১৯৬-৯৭

৪৯ ঐ, পৃ. ১১০

৫০ ঐ, পৃ. ২৩০

৫১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈ. মু. আ. রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ॥/.-॥৵

৫২ তুলনাহীনা, (১ম প্রকাশ), পৃ. ২৯

৫৩ ঐ, পৃ. ৬৪

৫৪ ঐ, পৃ. ২০৫-০৬

৫৫ ঐ, পৃ. ১৪৬

৫৬ ঐ, পৃ. ২৩২